KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. KLMLGK 200	Place of Publication 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection KLMLGK	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol & Number ১২/- ১৪/- ১৯/- ২০/- 20/-	Year of Publication ভাদ্র ১৩৭১ // Sep 1964 জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ // June 1968 কার্তিক ১৩৭৮ // Nov 1971 আষাঢ় ১৩৭৯ // July 1972 অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ // Dec 1972
	Condition Brittle Good ✓
Editor আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বাংলা দেশে এই প্রথম ত্রৈমাসিক "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" পত্রিকার উদ্যোগে

পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন

বাংলা সাহিত্য ও মনন নানা দিকে, নানা স্রোতে প্রবাহিত। তার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য মাঝে মাঝে শোনা যায়। তাই একদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্য দলীয় রাজনীতির কণ্ডূয়ন, নয়ত বিকৃত যৌনাচারের প্রতিবিম্ব অথবা বিকৃত অপরাধ-প্রবণতার উষ্ণ প্রস্রবণ। যে প্রচণ্ড মত্ততা আজ মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সেই ভীষণ মত্ততাই সাহিত্য-সূর্যকে রাহুগ্রস্ত করে তুলেছে। সেইজন্য সমস্ত চিন্তাশীল মনীষীই সাহিত্যের তথা সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত। সমগ্র বাংলা সংস্কৃতির এই দ্বিধাগ্রস্ত বিপর্যয়ের মুখে কেবলমাত্র চিন্তাশীল প্রবন্ধ-সমালোচকগণই যথার্থ পথনির্দেশ করতে পারেন। তাই এই প্রবন্ধ-লেখক সম্মেলনের আয়োজন। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানসূচী পরে জানানো হবে।

●

সভাপতি
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কার্যকরী সভাপতি
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

●

উপদেষ্টা
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রবোধচন্দ্র সেন
নীহাররঞ্জন রায়

●

সহঃ সভাপতি
অন্নদাশঙ্কর রায়
আশুতোষ ভট্টাচার্য
রমা চৌধুরী

●

পৃষ্ঠপোষক
অশোককৃষ্ণ দত্ত

●

সম্পাদক
সঞ্জীবকুমার বসু ও সনৎকুমার মিত্র

●

কোষাধ্যক্ষ
যোগেন্দ্রমোহন সেন

॥ কার্যকরী সদস্য ॥

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত * সুকুমার সেন * প্রমথনাথ বিশী * অমলেন্দু বসু * বিজনবিহারী ভট্টাচার্য * দেবীপদ ভট্টাচার্য * সরোজ আচার্য * বেলা লাহিড়ী * বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় * অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় * নন্দগোপাল সেনগুপ্ত * ভবতোষ দত্ত * সুশীল রায় * পুলিনবিহারী সেন * নারায়ণ চৌধুরী * উমা রায় * দক্ষিণারঞ্জন বসু * অমিতাভ চৌধুরী * জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় * উজ্জ্বলকুমার মজুমদার * ক্ষিতিশ রায় * নীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত * রমেশ ঘোষাল * দেবব্রত মুখোপাধ্যায় * ভবানী মুখোপাধ্যায় * আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত * জয়ন্তী সেন * রমা বসু * অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় * শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় * ক্ষেত্র গুপ্ত ও স্বপ্না দত্ত

* সম্মেলনে সদস্যরাই যোগ দিতে পারবেন। চাঁদার হার : সদস্য : ৫ টাকা। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য : ১০ টাকা এবং বিশেষ সদস্য : ২৫ টাকা।

টাকা এই নামে পাঠাতে হবে :
TREASURER,
West Bengal Essayist conference,
10, Hastings Street,
Calcutta-1

কার্যালয়
উল্লিখিত ঠিকানায় ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করা যেতে পারে। ফোন : ২৩-৯৯০০

চিঠিপত্র ও রচনা পাঠাবার ঠিকানা
শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু,
সম্পাদক,
পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন,
১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১

॥ এই উপলক্ষে একটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে ॥

ষোড়শ বর্ষ ২য় সংখ্যা   জ্যৈষ্ঠ তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

বটতলার বইগুলো ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৮৯

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ॥ অশ্রুকুমার সিকদার ১ ২

কবি দান্তে ॥ সত্যভূষণ সেন ১১৫

আলোচনা : আজকের কবিতা ও পাঠক ॥ সুচেতা ভট্টাচার্য ১২৩

সমালোচনা : আকাশ প্রদীপ ॥ শোভন গুপ্ত ১২৭

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বটতলার বইগুলো

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বটতলার বইয়ের যুগ শুরু হয়েছিল ১৮২০ সালের কাছাকাছি। বটতলার বিভিন্ন বইয়ের নামোল্লেখ করতে গেলেও মহাভারতের সৃষ্টি হবে। আমরা বটতলার বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ কয়েকটি 'ঐতিহাসিক' বইয়ের কথা বলব। প্রথমেই বটতলা ও 'বাবু' যুগের সহজসাম্নিধ্য প্রসঙ্গে বাবু চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত বইয়ের কথা ধরা যাক। রামমোহনের সম্বাদকৌমুদী থেকে মতান্তরের ফলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮২২ সালের ২৩শে মার্চের আগেই তাঁর সমাচার চন্দ্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ভবানীচরণের জীবনী অনুযায়ী 'নববাবু বিলাস' তাঁর প্রথম রচনা। ভবানীচরণের দ্বিতীয় রচনা 'কলিকাতা কমলালয়' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৩৭ সাল বঙ্গাব্দ ১৮৩০ সালে। অর্থাৎ নববাবু বিলাস প্রকাশিত হয়েছিল তার আগেই। অবশ্য ১৮৫৩ সালের বটতলা সংস্করণের আগে নববাবু বিলাসের কপি আজও 'আবিষ্কৃত' হয়নি। তবু লক্ষণীয় শ্রীরামপুরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ১৮২৫ সালের প্রকাশিত সংস্করণের সমালোচনা করে লিখেছেন 'the Amusements of the Modern Babu a work in Bengali, Printed in Calcutta. নববাবু বিলাসে ভবানীচরণ 'হঠাৎবাবু'দের চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন। লঙসাহেবের তালিকা অনুযায়ী নববাবু বিলাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে। মুনসী আবদুল জব্বিমের মতে নববাবু বিলাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৮ সালে। অর্থাৎ আলালের ঘরে দুলাল রচনার অনেক আগেই নববাবু বিলাস প্রকাশিত হয়ে একাধারে বটতলা ও বাবুর ঐতিহাসিক প্রথম সাক্ষী হয়ে রয়েছে। স্বয়ং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই বহু সচিত্র বই প্রকাশ করেছেন কিন্তু 'বাবু' সম্পর্কে বটতলায় এই প্রথম লিখিত

আলোকপাত। ১৮৫৫ সালে লঙ তাই নববাবু বিলাসকে one of the ablest Satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago বলেছেন। নববাবু বিলাস যে বটতলারই অবদান তার পরোক্ষ প্রমাণ এর অজস্র সংস্করণ। শুধু তাই নয় ১৮৫৭ সালে এর বটতলা সংস্করণের সঙ্গে এর একটি নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়ে-বটতলার ব্যবসাভঙ্গীকে উজ্জ্বল করেছে।

বটতলার বইয়ের বিষয়বস্তু (plot) বুঝতে গেলে চিৎপুর রোড, সোনাগাছি ইত্যাদির সামাজিক গুরুত্বও জানা দরকার। পৈতৃক ধনে ধনীবাবুর কুৎসিত ভোগবিলাসের সঙ্গে বটতলারই পড়সীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, উপরন্তু বাবুদের বসবাসও সারা চিৎপুর রোডের ধারে ধারে। খিস্তি খেউড় খেমটা আখড়াইয়ের আটচালাও এই পল্লীতেই।

এই ভৌগোলিক আত্মীয়দের পরিচিতি সুস্পষ্ট হতে পারলে বাবুকে চিনতে সুবিধা হবে বিলক্ষণ। 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমীদান, আড়িযুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।' এই উপদেশে দীক্ষিত করে নতুনবাবুকে উপদেষ্টা, 'উত্তম বুদ্ধিমতী পরম ধার্মিকা বকনাপ্যারী'র কাছে নিয়ে যায়। 'জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনা ধন্যা' প্যারী নামটি বটতলার বইয়ের বহু পতিতা চরিত্রেই স্থান পেয়েছে। এযুগে বটতলাতে লেখকরা বড় বেশি কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে বাস্তব অনুসরণ করতেন বলেই প্যারীর অস্তিত্বে কৌতূহল হয়। ১৮১০ সালে গরাণহাটা ষ্ট্রীটেই লক্ষ্মীরাণী প্যারীর উল্লেখ মধুসূদনও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় করেছেন। যাই হোক 'দীক্ষান্ত ভাষণ'টি 'ঐতিহাসিক'। 'যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে ইহাদিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের (যাহাদের) বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা, কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ রসুন যাহারা আহার করিয়া থাকে তাহাদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন কিছুতেই পাইবা না। যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিব ইহাতে পাপ হইবেক তাহা কদাচ মনে করিবা না। সুখজনক কর্ম করিলে যদি পাপ হইবে তবে কি শ্রীশ্রী৺ সুখসাধন ইন্দ্রিয়কে সজনক কর্মে নিযুক্ত করিতেন।···অতএব বাবু তোমাকে কহিতেছি তুমি সর্বদা যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবা'। যবনী সম্ভোগ সম্বন্ধে মাইকেলও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ তে একই বক্তব্য বসিয়েছেন ভক্তপ্রসাদের মুখে। শোনা যায় যবনী সম্ভোগের এ রীতি মাইকেল তাঁর কোন পরিচিত চরিত্রে লক্ষ্য করেছিলেন। ভক্তপ্রসাদ নাকি তাঁর কোন আত্মীয়। অবশ্য রামগতি ন্যায়রত্ন ব্রাহ্মণের নামে এই অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন ব্রাহ্মণ বহু কুকাজ করলেও এ ধরনের 'জাতিভ্রংশকর' কিছু করতে পারে না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মাইকেল ভক্তপ্রসাদকে সমর্থন করেছেন!

নববাবু বিলাস নিয়ে আর আলোচনা করার দুঃসাহস না থাকায় বোধ হয় এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে সমগ্র বইয়েই এই বক্তব্য, আর ভবানীচরণের নববিবি বিলাস, দূতীবিলাস বই দুটি আরও অশ্লীল। অবশ্য গ্রন্থ রচয়িতা ভবানীচরণের বিপরীত সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর রক্ষণশীল প্রয়াস 'শুদ্ধ' ভাবে শ্রীমদ ভাগবৎ প্রকাশনায়। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মন নিয়ে ভবানীচরণ সেখানে ব্রাহ্মণ কম্পোজীটার ও গঙ্গাজলে গোলা কালি দিয়ে ছাপান বইয়ের দাম করেছিলেন চল্লিশ টাকা। ব্যবসায়ী ভবানীচরণই বটতলার আসল রূপায়ন। বটতলার একদিকে আদিরসের ঘোলাটে নর্দমা

অপরদিকে অনাদিরসে প্রেষ্টিজ পাবলিকেশন। একই নদীর এই দুই তীরের মাঝে তরী-বটতলা একচক্ষু হরিণের মত কেবল লাভের লোভে বই ব্যবসায়!

বটতলার প্রথম ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর এবং সুকুমার সেনের মতে শেষ শিল্পী কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্নও মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন তাঁর নক্সার সঙ্গে। যদিও প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর ভবানীচরণ সুলভ লাভের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্র ছিল না। কিন্তু ডঃ সেনের মতে 'ভক্তেরা কি বলিবেন জানি না ভবানীচরণ ও কালীপ্রসন্ন একই ধরনের সাহিত্যিক ছিলেন'। সম্ভবতঃ এটা স্থূল বিশ্লেষণ কারণ ভবানীচরণ লোভী ব্যবসায়ী, কালীপ্রসন্ন ধনী ও ঘোর 'বাবু'। তাই কালীপ্রসন্ন মহাভারত বিলিয়েছেন, নকসাও বিক্রী হয়েছে পয়সায় দুখানা। কালীপ্রসন্নের এই মহাভারতই বটতলায় ধর্মগ্রন্থের দাম টেনে নামিয়ে এনেছে। কালীপ্রসন্নের আশ্রিত এক বালক (প্রতাপচন্দ্র রায়) এই বই বিলোবার দৃশ্য দেখে পরবর্তী জীবনে বটতলায় ধর্মগ্রন্থের এক বিরাট পাবলিসার হয়ে উঠেছিলেন।

বটতলায় এই ধর্মগ্রন্থের আয়োজনের পিছনে এক সুদীর্ঘ প্রয়োজনের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। বটতলায় তখন ধর্মগ্রন্থ বলতে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থই বোঝাত। লঙ সাহেবের তালিকায় ধর্মগ্রন্থ বলতে প্রায় সব বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থই বুঝিয়েছে। শ্রীরামপুরের পাদ্রী পুস্তক আলো ছড়াতে চাইতো কলকাতার আলোকিত ধনী মহলে, কিন্তু রক্ষণশীলতার দুর্গে অর্গল বদ্ধ হিন্দুধর্ম তখন আচারসর্বস্ব কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে—যার অপব্যাখ্যায় পুঁথির প্রয়োজন পড়ে না। কূপমণ্ডূক চণ্ডীমণ্ডপীয় হিন্দু বইয়ের নিন্দা করত কারণ বইয়ের চেয়ে বড় লোকপরম্পরা যুক্তিবিহীন বিশ্বাস যা তর্কে বহু দূর। 'আসল কথা এই যে সেকালে বাংলা সাহিত্যের খাঁটি খরিদ্দার ছিল বৈষ্ণব ঘরের লোকেরা। ভেকধারী বৈষ্ণবীরা ত বটেই, গৃহস্থের মেয়েরাও তখন লেখাপড়ায় দুরন্ত ছিলেন।'

এই প্রসঙ্গে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের একটি বিরাট দিক লক্ষণীয়। এ যুগে 'বাবু' পুরুষেরা আমোদ প্রমোদের উপকরণ পেয়ে পরিতৃপ্ত—যার অভাবে চিকের আড়ালে অন্দরমহলের বাসিন্দারা স্বভাবতই কড়ি খেলা এবং পরে বই পড়ার দিকে মন দিয়েছিলেন। জীবনের ধর্ম অনুযায়ী এই সব আনন্দ বঞ্চিত নারী আদিরসাক্রান্ত বইয়ে আকর্ষণ সাধারণত বেশী করতেন না।

সবচেয়ে বড় কথা স্ত্রীশিক্ষার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার কিছু আগে থেকেই অন্দর মহলে শিক্ষার আলো অনুপ্রবেশ করছিল। আর এই লেখান পড়ানর দায়িত্ব পড়েছিল বৈষ্ণবীদের কাঁধে। পিতৃস্মৃতিতে সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, 'আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চা বড় একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা এমনকি সংস্কৃত শিক্ষা করিত তাহাদের নিকট শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং সেকেলে দুই একখানা গল্পের বই পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করা হইত।···আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পর্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল।' বস্তুত এই বৈষ্ণবীরাই অন্দরমহলে ধর্মগ্রন্থের এক চাহিদা সৃষ্টি করেছিল। বলাবাহুল্য শিক্ষিতা বৈষ্ণবীরাই সংস্কৃত পুঁথি নকল করে বটতলাকে দিতেন।

লড সাহেব কলকাতায় এক বাংলা ও সংস্কৃত জানা বৈষ্ণবী বিধবার কথা উল্লেখ করেছেন যিনি পুঁথি নকল করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মোটামুটি ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে লক্ষণীয় এর সামাজিক চাহিদা, বিক্রেতার অব্যবসায়িক মনের জন্য অন্নদাম যার ফলশ্রুতি অস্পষ্ট মুদ্রণ ইত্যাদি।

বটতলার অন্য শ্রেণীর বইগুলো রুচির প্রশ্নে আজ অশ্লীল হলেও ঐতিহাসিক আঙ্গিকে সেসব বইকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় কিনা সন্দেহের বিষয়। মনে রাখতে হবে এযুগে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটেনি অথচ ফিরিঙ্গি বণিকের সহবাসে আমরা কিছুত দেশী ইংরেজী জানায় অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছি। এই আধো-অজানার কুয়াশায় অর্দ্ধশিক্ষিতদের সদ্য জাগ্রত নবীন ক্ষুধা সর্বপ্রসঙ্গে। বলাবাহুল্য গঙ্গাকিশোর তখন প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করলেও ঠিক সংবাদপত্র পাঠের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়নি বরং প্রতিবেশীর (মানুষ দেশ সবকিছুই) সংবাদ জানতে আমরা উদ্‌গ্রীব। বিশেষতঃ সে সংবাদ যদি হয় আদিরস গঠিত এবং অকৃত্রিম পরচর্চার খোরাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অত্যাচার—কয়েকজনের বিদ্রোহ, বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপের হুংকার ও অবশেষে পরাজয় এই ইতিহাস ধারা সেদিন বটতলাকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। বহু সামাজিক আচারের বিবর্তনের সেই transition period-এ বটতলাই সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়েছিল, অবশ্য এ অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্কেলে। সেযুগের সামাজিক সমস্যা কৌলীন্য প্রথা, অসমবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, এবং সর্বোপরি সতীদাহ থেকে বিধবাবিবাহের বিদ্রোহকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আলোচনা করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার সতীদাহপ্রথা রোধের আন্দোলনে রামমোহন বটতলার সাহায্য পাননি। তবু সফল হয়েছিলেন। সতীদাহপ্রথা থেকে মুক্তা (১৮২৯ সাল থেকে) বহু বিধবা তখন সমাজে আরও বড় সমস্যার কার্যকল সৃষ্টি করলেন। বাংলাদেশের চরম সামাজিক বিকার পতিতাপ্রবাহ বস্তুত এদিক থেকেই সবচেয়ে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকার (১৮৬৮ সাল) প্রথম সংখ্যাতেই দুশোটি পতিতার ইনটারভিউ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে জানা যায় তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিধবা। অত্যাচার, দারিদ্র্য, জীবিকা—প্রণয়ী নির্বাচনে ভ্রান্তি, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই বিধবারাই সেদিন পতিতা পল্লীতে আশ্রয় পেয়েছিল। বলাবাহুল্য বটতলা সমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠান নয়, বইয়ের ব্যবসায়ী মাত্র তারা পতিতার অতীত ইতিহাসকে আদিরসের কড়া ডিমেনে চাপিয়ে উত্তেজক বই প্রকাশ করেছে বহু কিন্তু সমস্যা সমাধান করতে চায়নি বিন্দুমাত্র।

সমাজের বিভিন্ন ব্যভিচারের মধ্যে বোধকরি সর্বপ্রধান যৌনসমস্যা। এরমধ্যে অস্বাভাবিক বিবাহ, প্রেম প্রণয়, পতিতা সবগুলিই পড়বে। অস্বাভাবিক বিবাহ বলতে আমি যে বিবাহে কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদি সামাজিক প্রথাগুলি অনিষ্ট করে তার কথাই বলছি। ইতিহাস গত ভাবে সংবাদপত্রবিহীন সেদিনের কলকাতায় সমাজের ব্যভিচার পরচর্চার খোরাক হিসেবে প্রথমেই স্থান পেত বারোয়ারী তলার সঙে। অশিক্ষিত মানুষেরা অন্যায়কে প্রতিবাদ করার প্রত্যক্ষ সাহস না থাকলে সাধারণত এ রীতি নিয়ে থাকে বলেই আজও গ্রামের মেলায় গাজনের সঙে গ্রামের ব্যভিচার স্থান পায়। মনে রাখতে হবে সে যুগের নীতির মানদণ্ড ছিল সম্পূর্ণ পৃথক।

পতিতা ও রক্ষিতা সম্পর্কে আজকের মত একই impression ছিল না। তারচেয়ে বড় কথা সেদিন গোপনতা গুণ বলেই বিবেচিত হত। যৌন সমস্যার সবচেয়ে নিন্দনীয় অধ্যায় ছিল 'ধরা পড়া'। এ সমস্ত প্রসঙ্গগুলো আলোচনার পক্ষে স্পষ্টতই অন্তরায়কর বরং আমরা বারোইয়ারীতলার বিভিন্ন সঙের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলেই বটতলার বইয়ের নাম (title) ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা পাব।

যৌনসমস্যার যে প্রধান অঙ্গ অস্বাভাবিক বিবাহ তার জন্ম সমাজের অর্থহীন আচার ও অনুশাসনে। কৌলীন্য প্রথার তখন সর্বত্র জয় জয়কার। 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা' প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের দুর্দশা যে কতদূর হয়েছিল তার বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকট। 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় জানা যায় পূর্ববঙ্গে বারেন্দ্র কুলীন আছেন তাঁদের সর্বসমেত ৬২২টি বিবাহ। একজনের বিয়ে সর্বাধিক ৮০টি এবং আরেকজনের সর্বনিম্ন ৪০টি। সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন চূড়ামণির বয়স তখন সত্তর বছর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে জানিয়েছেন পঞ্চাশ জন ব্যক্তি গড় পড়তায় পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে ১৯৬০টি বিবাহ করেছিলেন। অর্থাৎ সেযুগে একশ্রেণীর কুলীনদের পক্ষে বিবাহ ছিল বৃত্তি। সম্বাদ ভাস্করে চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন অনেক কুলাভিমানী একটি পরিচারক রাখতেন তার স্ত্রীর সংখ্যা-তালিকা রাখবার জন্য। ভৃত্যের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এক এক শ্বশুর বাড়ি যেতেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুল সর্বস্বে জানা যায় যে শ্বশুরালয়ে ভিজিট দিলেও একটা নির্দিষ্ট ফী (ব্যভার) না পেলে স্ত্রী সহবাস করতেন না তাঁরা। এইভাবে 'বিবাহ বণিক' কুলীনদের কল্যাণে বাংলাদেশের কুলীন মেয়েরা এক নিদারুণ অতৃপ্তির জালে জড়িয়ে যেতেন—এবং কেউ কেউ 'উত্তর সাধক' পেলে গৃহত্যাগ ও পরিণতিতে পতিতাবৃত্তির পথ নিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে কৌলীন্য বংশগত রূপ থেকে অর্থগত রূপে বিবর্তিত হয়েছিল। বস্তুত কৌলীন্য ও পণপ্রথার সাঁড়াশী আক্রমণে সেদিনের বাংলার কুমারীরা যে দীর্ঘনিঃশ্বাস আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তারই শ্মশানভূমি ছিল বটতলা ও সোনাগাছি, যথাক্রমে সাহিত্যে ও জীবনে। প্রথমদিকে আদিম যুগের মত কৌলীন্য প্রথার ঠিক বিপরীত মতে মেয়ের বাবাই টাকা পেতেন পণ হিসাবে। কিছুদিন পরেই উলটে গেল মতটা বলেই কুলীন বৃদ্ধরাও 'দামী' হয়ে উঠলেন। কৌলীন্য ও পণপ্রথার ফসল হিসাবেই বাংলাদেশে তখন বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ অসমবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক দুর্বিপাক এবং সেই সঙ্গে ভ্রূণহত্যা, অনাচার, প্রভৃতি যৌন দুর্নীতি।

বটতলার প্রথম পর্বের বইগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি কিন্তু বটতলার স্বর্ণযুগে সামাজিক সমস্যাগুলো যে বটতলার বই-ব্যবসা শুরু হয়েছিল সেগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে মেয়ের মা পণপ্রথা বাবদ টাকা পেতেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের রীতি অনুযায়ী। বাংলাদেশের নিচু জাতের সঙ্গে এই মাতৃতান্ত্রিক প্রথাটি একদা প্রচলিত ছিল।

বাল্যবিবাহ সমস্যাকে 'সমস্যা' রূপে বিবেচনা করাটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মত। স্পষ্টতই বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গী সভ্যতার প্রভাবে পড়ে শিক্ষিত বাঙালী বাল্যবিবাহকে সমস্যা মনে করেছে ১৮৬০ সালের পর। ১৮৬০ সালেই শ্যামাচরণ শ্রীমানি বাল্যোদ্বাহ নাটক রচনা

করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে যখন consent bill গৃহীত হয় তখনই বটতলা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বারো বছর আগে কোন স্ত্রীর পক্ষে স্বামী সহবাস নিষিদ্ধ করার এই প্রস্তাবে রক্ষণশীল সমাজ চঞ্চল। '১৫ জ্যৈষ্ঠে যেমন আম পাকে না' তেমনি কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন মেয়ে সহবাসযোগ্যা হয়ে ওঠে না এই ছিল তাঁদের মত। অতএব এটা কোম্পানীর পক্ষে নাগরিকের শোবার ঘরে অনুপ্রবেশ। ১২৯৭ সালে সংবাদপত্রে জানা যায় এই বিলের বিরুদ্ধে গড়ের মাঠে বক্তৃতা ও কালীঘাটে যাগযজ্ঞও হয়েছিল। এই সময় বটতলায় বইয়ের স্রোত। রসরাজের 'সম্মতি সঙ্কট' থেকে হরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আইন বিভ্রাট' (১৮৯০) পর্যন্ত।

বাল্যবিবাহের পর অসম বিবাহ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান যদি অস্বাভাবিক হয় তবে তা যৌন অতৃপ্তির কারণ হতে পারে। আমরা বিধবা বিবাহ আইন চালু হবার আগের সমস্যা নিয়ে যা বলেছি এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বটতলা জানাল এইভাবে অতৃপ্তির থেকেই অনেক নারী নাকি পতিতাজীবন গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য কৌলীন্য প্রথা ও পণপ্রথা অসমবিবাহের কারণ। কুলনারীর ব্যভিচার ও অবৈধপ্রণয় দেখতে গেলেই বটতলা তাই অসমবিবাহের যুক্তি দেখিয়ে বাজার চাইত। 'এমন বরে বিয়ে দিয়েছে গোঁফ দাড়িটা পাকা' এহেন অজস্র ছড়া থেকে বোঝা যায় অসমবিবাহ সমস্যা একদিন মেয়েদের মুখে মুখে লোকসাহিত্যেও স্থান পেয়েছিল। 'বুড়ো দিলে বুড়ো বর' অথবা 'এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়া' ইত্যাদিও বহু প্রহসনের টাইটেলে ব্যবহার করতে হয়েছে।

কৌলীন্য ও পণপ্রথার ফলে 'আপনা হতে জ্যান্তে মরা' বৃদ্ধের দল চিতায় শোয়ার লগ্ন পর্যন্ত বিয়ে করে চলতেন। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' ১৮৭৪ সালে এক অজ্ঞাত লেখকের প্রহসনের নাম। ১৮৭৬ সালে কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার রচনা করেন 'শ্যামের বিয়ে'। বস্তুত এই সব অজস্র প্রহসনে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত থাকত না বরং কুলনারীর ব্যভিচার, বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রীর মদ্য পান, অবৈধপ্রণয়, আত্মীয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, 'ব্রাহ্মমতে পুনর্বিবাহ', ইত্যাদিই বেশী স্থান পেত। অবশ্য এই সঙ্গে কুলীন বিবাহ-বণিক ব্রাহ্মণের ব্যভিচারও স্থান পেয়েছে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'আক্কেল গুড়ুমে বা কুলের প্রদীপে' (১৮৮২)। ১৮৮০ সালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'অযোগ্য পরিণয়', শম্ভুনাথ বিশ্বাস 'কচকে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা' (১৮৮৩) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী 'কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে' এ সময়েই রচিত হয়। মনে রাখতে হবে অসমবিবাহের পরিণতি শুধু স্ত্রীর যৌন অতৃপ্তি নয় বৃদ্ধ স্বামীর স্নৈণতাও বটে। ১৮৮৪ সালে রামকানাই দাস 'মার্গ সর্বস্ব' রচনা করেন। এই সময়ে বটতলার প্রফুল্লনলিনী দাসীর 'ষষ্টি বাঁটা প্রহসন' প্রকাশিত হয়। রচনার আধুনিকতায় আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুমান রচনাটি কোন ছদ্মনামী পুরুষের। সেক্ষেত্রে এটি বটতলার অন্যতম 'stunt'। স্নৈণ বৃদ্ধ প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বুড়ো বাঁদর'-ও উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২ সালে বটতলাতেই কৃষ্ণবিহারী রায় 'পশ্চিম প্রহসন' রচনা করেন।

এইভাবে বটতলা আপন ব্যবসায়িক স্বার্থে সেযুগের বহু সামাজিক সমস্যা নির্ভর করে বই প্রকাশ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজে সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার বহু বিচিত্র পরিস্ফুটন

হয়েছে বটতলার বইয়ে বইয়ে। অসম বিবাহের আরো একটি 'আধুনিক' কারণ পণপ্রথা। পণপ্রথাকে কৌলীন্য প্রথার মত 'পূর্বপুরুষীয়' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলেই আজও আইন রচিত হয় এ প্রসঙ্গে। বস্তুত শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমস্যার হ্রাস হলেও পণপ্রথার উগ্রতা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। গেট বলেছেন 'the degree of B. A. is a very valuable asset in the matrimonial market। আগে কৌলীন্য প্রথার নামে যে অত্যাচার চলত, নাম বদলে এ যুগে তাই হল 'পাশ করার ডাকাতি'। মোহিনীমোহন সেনগুপ্ত তাই রচনা করলেন, 'পাশকরার ডাকাতি বা বরকন্যা বিক্রয়'। 'বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়' এই গানটি বটতলার প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি'-র অন্তর্গত। 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন 'এই ব্যবসায়ে যে ব্যক্তির পুঁজ আছে সে অতি ভাগ্যবান কেননা এ উপার্জনে পরিশ্রম নাই, ইহাতে রাজস্ব নাই, রাজকর নাই।'

'বিয়ে ফাঁদতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি' এই প্রবাদবাক্যে পণপ্রথার অশুভ দৌরাত্ম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রসরাজ অমৃতলাল বসুর গানে 'পাঁঠা পাঁঠার মত বেটা বেচী বেচাবেচি' নিন্দা করা হল। পণপ্রথার পরোক্ষ প্রভাবে আর এক অসম বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হল অযোগ্য পাত্রে অর্থলোভে কন্যাদান। অবশ্য এ ক্ষেত্রে পণপ্রথাটি আদিম। যখন কন্যার পিতাই কন্যা বিক্রয় করতেন এবং বরকর্তা ছেলের বিয়ে দিতেন marriage by purchase প্রথায়। ১৮৬৩ সালে কবি হরিশচন্দ্র মিত্র 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' প্রহসনে এই ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন। অর্থলোভে অপাত্রে কন্যাদানের উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়েছেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলী বাঁধে' প্রহসনে। ভোলানাথ প্রসঙ্গ পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। ১৮৭৯ সালে হীরালাল ঘোষ 'রোকাকড়ি চোকামাল', গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'এই কি সেই' এবং দুর্গাচরণ রায় 'পাশকরা ছেলে' প্রহসন প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ সালে 'জনৈক শোত্রিয় ব্রাহ্মণ' প্রকাশ করেন 'অমৃতোদ্বাহ' প্রহসন। এ সময়ই ১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ 'নয়শো রুপেয়া', ১৮৭৯ সালে দুর্গাচরণ রায়ের 'পাশকরা ছেলে' ১৮৮৬ সালে রাধাবিনোদ হালদার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ১৮৯০ সালে রাজকৃষ্ণ রায় 'লোকেন্দ্র গবেন্দ্র প্রহসন', ১৮৯৩ সালে যতীন্দ্রচন্দ্র শর্মা 'কন্যাদায়', ১৮৯৬ সালে দুর্গাদাস দে 'ছবি' এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কন্যাদায়' প্রহসন রচনা করেন এই পণপ্রথা প্রসঙ্গে। ১৮৮০ সালে রাধাবিনোদ হালদারের 'পাশকরা জামাই' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে রসরাজের 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বহু সমস্যার মধ্যে বটতলা কেবল নারীঘটিত সমস্যা (পণপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি) আলোচনা করেছে। শুধু তাই নয় এই সব সমস্যা তারা ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা করতে চেয়েছে সমস্যা সমাধানের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। বটতলার ব্যবসায়ী মনের এই ধর্ম।

বটতলা নারীঘটিত সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করে আধুনিক plot সমন্বিত কাহিনী বিন্যাস করলেও মূল লক্ষ্য ছিল তার যৌনসমস্যা। যৌনসম্পর্কের অস্বাভাবিকত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে উপাদেয়—বইয়ের hot saleএর ক্ষেত্রে সিওর সাকসেস মেড ইজি। বাংলার সামাজিক সমস্যা যে বটতলার লক্ষ্য ছিল না তার প্রমাণ বটতলায় বহুবিবাহ সংক্রান্ত বই প্রকাশিত

হয়নি। অথচ এ যুগে সমাজে বহুবিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল। কিন্তু এ সমস্যার পরিণতি হিসেবে সতীসাধ্বীর দেশে বিশেষ কিছু প্রকাশ্য বিদ্রোহ লক্ষিত হয়নি। কোন কাহিনীও শোনা যায় না যে সতীনের জালায় কোন নারী পরপুরুষ অবলম্বন করেছে। সতীনদের মধ্যে জঘন্যতম 'বোন-সতীন' সম্পর্কে কুমারীকন্যা অজস্র ছড়া গেয়ে ব্রত পালন করেছে বটে কিন্তু কার্যকালে 'সুয়োরাণী দুয়োরাণীর' রূপকথা মত ঘাড় গুঁজে সংসার করে। বড়জোর আত্মঘাতিনী হয় কিন্তু পথে নামে না। বলা বাহুল্য বাংলার নারীর এই 'সতীত্বপনা' বটতলার চোখে লাভজনক বিবেচিত হয়নি। সমাজের এই উজ্জল দিকটিই বটতলার অন্ধকারে তাই অসূর্যম্পশ্যা রয়ে গেছে।*

আমরা বার বার বলছি বটতলা সমস্যাকে ভাঙিয়ে পয়সা পিটতে এসেছে—সমাজ সংস্কার তার উদ্দেশ্য ছিল না। ১৮৬০ সাল নাগাদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের নেতৃত্বে সমাজ-সংস্কারক গোষ্ঠীর সৃষ্টির সঙ্গে বটতলার স্বর্ণ যুগের অবসান হয়ে গিয়েছিল তবু বটতলা কোনদিন স্বধর্মচ্যুতির নাশ করেনি। আর বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার ব্যাখ্যায় যারা প্রথমে নেমেছিল বটতলায় তাঁরা কেউই ব্যবসায়ী ছিলেন না উপরন্তু নিজেরাই বাবু, নব্যবঙ্গ ছিলেন। বটতলা ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি আশঙ্কা করে এদের বহুভাবে ব্যঙ্গ করে নিরস্ত করতেও চেয়েছিল তাদের নতুন বইয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে ইংরেজীয়ানার অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। বিদেশী সভ্যতার সেই উত্তেজক মোহ বাঙালী যৌবনকে বলাবাহুল্য বিভ্রান্ত করেছে। চণ্ডীমণ্ডপীয় রাজত্বে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে 'উত্তাল মাতাল' নব্যবঙ্গেরা। সামাজিক বিন্যাস রীতি নীতি বিশ্বাস ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। তাই চণ্ডীমণ্ডপ কখনই নব্যবঙ্গের অসভ্যতাকে স্বাগত জানাতে পারেনি। নতুন ও পুরনোর এই দ্বন্দ্বকেও বটতলা কাজে লাগিয়েছে। transition period এর ধর্ম অনুযায়ী এই পরিবর্তনের যুগটিও সমসাময়িক ব্যঙ্গ সাহিত্য ও প্রহসনে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে।

বটতলার সে সমস্ত বইগুলোর শ্রেণীবদ্ধরূপ ও বর্গীকরণ করতে গেলে নব্যবঙ্গের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নব্যবঙ্গের কাছে ডিরোজিও প্রথায় মদ্যপান কালচারেরই অঙ্গ। 'কারণ'-অধ্যুষিত দেশে অল্পস্বল্প মদ্যপান 'বিদ্রোহ' বলে বিবেচিত না হতেও পারতো, কিন্তু নব্যবঙ্গের উদ্ধত ভাবটাই ছিল তীব্র আপত্তিকর, যে-যুগে আশীবছরের বৃদ্ধও নব্বই বছর বয়স্ক গুরুজন দেখলে পিছন ফিরে হুঁকো খেতেন সেযুগে এই প্রকাশ্য কালচারচর্চা বলা বাহুল্য অসভ্যতা নয়—'বিদ্রোহ'। গোমাংস, মুসলমানের 'বণ'রুটি এবং মদ তখন পঙ্গুধর্মের শিকলকাটার প্রথম ধাপ। চোখ বন্ধ উন্নতিকামী ডিরোজীয়ানরা অন্ধ আবেগে সেদিন এইগুলোকেই শিক্ষার অঙ্গ ঠাউরে যে উন্মাদনার প্রকাশ করেছেন তা রাজনারায়ণ বসু (স্বয়ং অন্যতম নব্যবঙ্গ হলেও) 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে উপহার দিয়ে গেছেন। 'কলিকাতার যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী কি বড় মানুষ কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।' লিখছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সুরাপান নিবারিণী সমিতির নেতা প্যারীচাঁদ মিত্র সেদিন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' প্রহসনের রচয়িতা। রাজকোষে এক্সাইজকর বাবদ আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানী নাকি শহরের যত্রতত্র মদের দোকান খুলতে অনুমতি দিয়েছিলেন এসময়।

কিন্তু শুধু মদ্য পানের বিদ্রোহ, বটতলায় লাভ নেই তাই সেই, স্ত্রীস্বাধীনতার বিকৃত ফলাফল

পাঞ্চ করে বটতলা জানালেন নব্যবঙ্গ নাকি স্ত্রীকে মদ্যপানে অভ্যাস করান কালচার মনে করেন। 'কলিকাতায় কোন কৃতবিদ্য সম্রান্ত লোক আপন স্ত্রীকে মদ্যপান করাইতেন এবং স্ত্রী তাহা অস্বীকার করিলে প্রহার করিতেন।' অবশ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হয়ে অনেক নব্যবঙ্গ নারীও মদ্যপান করতেন। বটতলার মতে তারা 'নেকাপড়া জানা' অথবা 'বেম্মজ্ঞানী'। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত 'সমাজ-সময়-সংস্করণ' প্রহসনে জানা যায় এক একজন গৃহবধূ নাকি মদ্যপানে স্বামীকেও টেক্কা দিতেন। অনেক নব্যবঙ্গ স্বামীর কাছে এ ঘটনা ফুলিয়ে গর্ব করে পাঁচজনকে শোনাবার মত বলেও বিবেচিত হত। নব্যবঙ্গে মদ্যপানকে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যঙ্গ করলেন অন্যতম নব্যবঙ্গ স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। বটতলায় অবশ্য তখন বইয়ের স্রোত শুরু হল। রামচন্দ্র দত্তের 'মাতালের জননীর বিলাপ', গোপালচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' প্রভৃতি প্রহসনে মদ গাঁজা ইত্যাদি বিবিধ নেশায় আসক্তির কথা বলা হল। স্ত্রীলোকের মদ্যপান প্রসঙ্গে কুঞ্জবিহারী বসুর 'তুই মা অবলা' (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য। সুরা ও সাকীকে বটতলা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে টুইষ্ট করেছে। মদ্যপান ও পতিতাগৃহে যাতায়াত সেখানে পাশাপাশিই ঘটেছে। ভৌগোলিক আত্মীয়কে বটতলা এইসব প্রহসনে যথাযোগ্য স্থান দিতে কোনদিনই ভোলেনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে!

কৌলীন্য প্রথা পণ প্রথা প্রভৃতির জন্য বাংলাদেশে যে বাল্যবিবাহ অসমবিবাহ তা অস্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহের জনক। এছাড়া সতীদাহ প্রথা রোধ ও বিধবা বিবাহ চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত অসংখ্য বিধবা সমাজে স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বস্তুত এইভাবে বাংলার ঘরে যৌনসম্পর্কের সম্ভাব্য দুর্বিপাককেও বটতলা কাজে লাগিয়েছে। ভ্রূণহত্যা, বিধবা আশ্রিতা আত্মীয়া সম্ভোগ ছাড়াও অনাচার (incest) ও বটতলার বইয়ে আশ্রয় পেয়েছে। হুতোমের নক্সার নকলে যে সাপ্তাহিক নক্সা প্রকাশিত হত তাতে ভ্রূণহত্যা প্রসঙ্গটি কুৎসিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বারোইয়ারী তলায় অন্দরমহলে এইসব কুৎসিত গোপনতাকে অবলম্বন করে সঙও বেরোত। বটতলা সবচেয়ে চালু সঙকে title করে বইও প্রকাশ করত। ১৮৬৭ সালে নিমাইচাঁদ শীল প্রকাশ করেন 'এরাই আবার বড়লোক' দুবছর পরে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রকাশ করেন 'চক্ষুদান'। মনে রাখতে হবে 'চক্ষুদান' শব্দটির লৌকিক একটি চলতি অর্থ থাকলেও বটতলায় শব্দটিতে 'চোখ ফোটান'র সাধু ভাষারূপে ব্যবহার করা হয়েছে। স্মর্তব্য, চক্ষুদান নামেই বটতলায় একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে।

সতীদাহ প্রথা রদ (১৮২৯) হবার পর বিধবা বিবাহ প্রথা চালু হবার আগে পর্যন্ত বাংলার ঘরে ঘরে বিধবারা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন তা ইতিহাসগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখের বিষয় বটতলার অশ্লীল বইগুলো ছাড়া সে সমস্যার উত্তাপ অনুভব করার আর কোন উপায়ও নেই। এই বিধবাদের কেউ কেউ অন্দরমহলে নৈতিক ব্যাভিচারের কারণ হয়েছিলেন। কেউবা বিদ্যাসাগরের মতে উত্তর সাধকের সন্ধান পেয়ে গৃহত্যাগও করেছিলেন—বলাবাহুল্য উভয় ক্ষেত্রেই পরিণামে অপেক্ষা করত কলঙ্কিত পতিতা জীবন। অন্তত বটতলা সেইভাবেই এদের পরিণতি বর্ণনা করেছেন।

১৮৭১ সালে বিপিন বিহারী দের 'একাদশীর পারন' ১৮৭৩ সালে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মা এসেছেন', শ্রীনাথ চৌধুরীর 'আমি ত উন্মাদিনী' (১৮৭৪), রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুসরণে শ্যামলাল বসাকের 'ইহারই নাম চক্ষুদান (১৮৭০) প্রভৃতি বটতলার বই এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে উত্তেজকভাবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৮১ সালে রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'গোলক ধাঁধা' (১৮৮২) বেচুলাল বেনিয়ার সচিত্র 'হনুমানের বস্ত্র হরণ' (১৮৮৫) উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখেছি কি বিচিত্র পরিবেশে গৃহবধূ বা কুমারীকন্যা পতিতা জীবন গ্রহণ করে। বটতলায় তা দেখিয়েছে। এবার বটতলা তার সবচেয়ে বড় বইয়ের বাজার নিল পতিতার প্রসঙ্গে বই প্রকাশ করে। ১৩০২ সালের মাঘ মাসে ভারতী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রঙ্গভূমির কর্তব্য প্রবন্ধে লিখেছেন 'অনেক বঙ্গীয় যুবক যে বারাঙ্গনালয়ে গতিবিধি করেন, তাহা আধুনিক বঙ্গ সমাজে একটি বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া। বাঙালী সমাজে অবরোধ প্রথার জন্য যুবক নিজের স্ত্রী ভিন্ন বিশেষ অন্য কোন রমণীর সহিত সদালাপ করিতে পান না। মাতা ভগিনী কন্যার সহিত শুদ্ধ কাজের কথা ভিন্ন কোন প্রকার ক্রীড়া রহস্য, বন্ধুভাবে তর্ক ও গল্প চলে না— সঙ্গীত চর্চার কথা দূরে থাকুক।...ইহার অভাব সে বড় বেশী অনুভব করে। এ অবস্থায় সে সৎনারীর সহিত সদালাপ ও সৎসংসর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যদি কু-নারীর সহিত কাদালাপ ও কুসংসর্গ করিতে যায় বিচিত্র কি!' নিশ্চয়ই বিচিত্র নয়। বাবুদের এবং নব্য বঙ্গের ক্ষেত্রে এ তথ্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ঘরে স্ত্রী, বাঈজী, ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তারা যে পতিতাপল্লীতে যেতেন তা সর্বদা দৈহিক প্রয়োজনে নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় নারীকণ্ঠ, নারী হৃদয়, নারীচরিত্রের বিচিত্র আকর্ষণ তাঁদের টানত। যে-যুগে থিয়েটারে স্ত্রীচরিত্র মেয়েলী পুরুষ ও বালক দিয়ে অভিনয় করান হত। চিকের আড়ালে অন্দর মহলে অনেক ফোটা ফুল অনাঘ্রাতা অবস্থায় শুকিয়ে যেতেন। সেযুগে পতিতার প্রয়োজন পড়ত বিভিন্ন কারণে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মাইকেল দেখিয়েছেন নব্যবঙ্গ পতিতা সংসর্গ করতো নিছক কালচারের জন্যই।

পতিতা গৃহে যাতায়াত যে কৃষ্টি ও কালচারের লক্ষণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরও 'স্কুলবালকের বেশ্যাগমনে'। রাজনারায়ণ বসু দুঃখ করেছেন যে স্কুল বালকেরা সে সময় পতিতা গৃহে যাতায়াত করত নিয়মিতই। বটতলার স্কুলটি পতিতালয়ের নৈকট্যজনিত অসুবিধা থেকে মুক্ত হক এই সমস্যা একদা আলোচিত ও স্বতন্ত্রভাবে পুনরালোচনা সাপেক্ষ। স্কুলবালকের বেশ্যাগমন অবলম্বনে বটতলার বহু বই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। হরিহর নন্দীর 'শিখছ কোথা, ঠেকছি যথা', গোবর্ধন মুখোপাধ্যায়ের 'তুই যে সর্বনেশে গোবর্ধন', মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ষ্টুডেন্ট রহস্য' দ্বারকানাথ মিত্রের 'মুষলম কুল নাশনম' নলিনীলাল দাশগুপ্তের 'ভালবাসার মুখে আগুন' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অর্থাৎ পতিতার প্রতি আকর্ষণ এযুগে দৈহিক নয় 'সামাজিক' ও কৃষ্টিগত। রক্ষিতার বাড়ি করে দেওয়া যে যুগে সামাজিক সম্ভ্রম সে যুগে পতিতা নিন্দনীয়া ছিলেন কিন্তু অনালোচ্য নয়। পতিতার অতীত জীবন সে যুগের বটতলায় বেষ্ট সেলার। সধবার একাদশীর শেষাংশ অনুসরণ করে ১৮৭৯ সালে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'আমি তোমারই' রচনা করেন। শৈলেন্দ্রনাথ

হালদার লেখেন 'কলির শেষ' (১৮৮০) দীননাথ চন্দ লেখেন 'কমলাকাননে কলমের চারার আঁটি' (১৮৮০) পতিতার সঙ্গে প্রেম অবলম্বনে 'কেউ আঁধারে আলো' রচনা করতে না পারলেও পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 'বিচিত্র অন্নপ্রাশন', সুধামাধব দাস 'দিল্লী কা লাড্ডু' অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'গাধা ও তুমি' (উপেন দাসের 'দাদা ও আমি' অনুকরণে) রচিত হয়েছে।

পতিতারা বটতলার বইয়ে সাধারণত অতীত জীবনে গৃহস্থ কুলবধূ হিসাবে চিত্রিত হয়ে থাকে। এর ফলে গৃহবধূ হিসেবে অন্দরমহলে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক, পরে বাড়ির বাইরে কোন উত্তর সাধকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ও পরিণতিতে পতিতা জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ কাহিনী রচনার সুবিধাও হত। ১৮৭০ সালে বটকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'কলির কুলটা প্রহসন', ১৮৮১ সালে অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'কলির মেয়ে ছোট বৌ ওরফে ঘোর মুখ', ১৮৮৩ সালে বিনোদ বসুর 'সরসীলতার গুপ্তকথা', ১৮৮৪ সালে নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'তিন জুতো', ১৮৮৫ সালে আশুতোষ বসুর 'সমাজ কলঙ্ক' ১৮:৬ সালে অজ্ঞাত লেখকের 'কচকে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা,' ১০৮৬ সালে এস, এন, লাহার 'গোপালমণির স্বপ্ন কথা', ১৮৮৮ সালে মণিলাল মিত্রের 'শান্তমণির চূড়ান্ত কথা' ও হারানশশী দের 'কলিকালের বস্তির মেয়ে' ১৮৯৫ সালে শরৎচন্দ্র দাসের 'এ মেয়ে পুরুষের বাবা' বইয়ে পতিতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

অনাচার (incest) বা নিষিদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে যৌনাচারের বর্ণনা পাওয়া যায় ১৮৬৮ সালে অজ্ঞাতলেখকের 'হেমন্ত কুমারীতে'। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় কালীপদ ভাদুড়ীর 'গুণের শ্বশুর' ও মহেশচন্দ্র দাসের মামা ভাগনীর নাটক'। এ সময় নটবর দাসের 'মককেল মামা'ও প্রকাশিত হয়। অবশ্য এ ছাড়াও বহু বইয়ে অনাচারের বর্ণনা, বিকৃতি, উল্লেখ, ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গটি এত অস্বস্তিকর যে বটতলা এই কুৎসিত দিকটির কি অশ্লীলতম ব্যাখ্যা করে বাজার নিতে চেষ্টা করত তা ব্যাখ্যা করা অসুবিধাজনক।

বটতলার বই পতিতা ছাড়া আরেক বিষয়ে নির্ভর করত তা হল সমসাময়িক ঘটনা। বাজারে যে ঘটনার আলোচনা বিতর্ক সবচেয়ে বেশী চালু থাকত বটতলা তার সুযোগ নিত। মুখরোচক পরচর্চার মত উপাদেয় চলতি বিষয় আর নেই। যথা চিৎপুর রোডের কোন ধনী গৃহে ভ্রূণহত্যার সংবাদের স্কুপ্ পাওয়া মাত্র বটতলা তাকে অবলম্বন করে বই প্রকাশ করত। সম্মানহানির দায় এড়াবার জন্য নাম বদলাত বটে কিন্তু ঘটনা একই থাকায় উদগ্রীব পাঠক লোলুপ রসনায় তা কিনতেন। ধনী গৃহের সংখ্যাল্পতা ও বসবাসজনিত নৈকট্যের জন্য লোকশ্রুতি জটলাও এ ব্যাপারে সাহায্য করত। Current ঘটনা নির্ভর কাহিনী রচনার ঢেউ তো বটতলায় যুগ যুগ ধরেই চলেছে। তারকেশ্বরের 'মোহান্তের বিচার সে যুগে সমাজে আলোড়ন এনেছিল। বহু নাটক অভিনীত হয়েছিল এ বিষয়ে। রসরাজ বলেছেন বটতলার বইওয়ালারা অনেক পয়সা রোজগার করেছেন এই উপলক্ষ্যে। 'তারকেশ্বর নাটক' অর্থাৎ 'মোহান্ত লীলা,' 'মোহান্তের কি এই কাজ', 'মোহান্তের কি এই কি দশা' ইত্যাদি বহু বই তার উদাহরণ। ভাওয়ালের সন্ন্যাসীর মামলা, জাল প্রতাপচাঁদের মামলা উপলক্ষ্যেও বটতলা বহু বই প্রকাশ করেছে। আজ বটতলার সীমিত বাজার ম্লান হয়ে আসায় কীলার, মনরো, নানাবতীর উপাদেয় খোরাক থাকা সত্ত্বেও

বটতলা এ সুযোগ নেয় না, নিতে পারে না। সে কাজ আজ কলেজ ষ্ট্রীট ও সংবাদপত্র বিশেষ নিজেদের মধ্যেই বণ্টন করে নিয়েছে।

সংবাদপত্রবিহীন কলকাতা তথা চিৎপুর রোডে শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বটতলার শুরু থেকেই। সাধারণ মানুষ know thy self এর সঙ্গে অপরকেও জানতে চেয়েছে। প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের চর্চা করে অংশ নিতে চেয়েছে। তাই সে যুগে চণ্ডীমণ্ডপ পেরিয়ে আমরা বারোইয়ারী তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। বারোইয়ারী তলায় তখন নিত্য নতুন সঙ। নব্যবঙ্গের যুগের কয়েকটি সঙের নাম হুতোম আমাদের উপহার দিয়েছেন 'হুদে নবাব', কি মজার গুড়ফ্রাইডে, কি মজার শনিবার, হদ্দমজার রবিবার, কি দুঃখ সোমবার এ ছাড়াও 'ইয়ং বেঙ্গল'? বলা বাহুল্য চতুর বটতলা তার বইগুলোর টাইটেল করেছে এরই আশ্রয় নিয়ে। সমাজে বহু পরচর্চা প্রথম আশ্রয় পেত বারোইয়ারীতলার সঙে, তারপর তেমন হলে বটতলার বইয়ে। বিশেষতঃ বটতলার প্রথম পটে শতকরা নব্বইটি বইয়ের নামকরণ হত বারোইয়ারী তলার সঙের নামে। পরে অবশ্য বটতলা আধুনিক হতে থাকে এবং নিত্য নতুন নামকরণের পন্থা আবিষ্কার করতে থাকে।

আমরা আগেই বলেছি বটতলার স্বর্ণযুগ ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ সন পর্যন্ত। আমরা এতক্ষণ ১৮৬০ সাল থেকে প্রকাশিত বটতলার কয়েকটি দিগনিদর্শন বইয়ের আলোচনা করলাম দু-এক কথায় কিন্তু তার আগের বইয়ের আলোচনা করতে পারিনি। বটতলার বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮২০ থেকেই। ১৮২০ থেকেই বইও প্রকাশিত হয়েছে। যেসব দিনের বইয়ের বর্ণনা আমরা পাই না। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যেসব সচিত্র বই প্রকাশ করেছিলেন তার অধিকাংশই পৌরাণিক ও ধর্মীয়। কোনটাই সামাজিক নহে। সেসব বইয়েরও কোন বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পাইনি। কোন পাঠক হয়ত জানিয়েছেন গঙ্গাকিশোরের সচিত্র বেতাল পঞ্চবিংশতি তিনি দেখেছেন কিন্তু বটতলার বই প্রসঙ্গে এ ধরনের বিক্ষিপ্ত বইগুলোর আলোচনা শুরু করলে কয়েক খণ্ড মহাভারতের প্রয়োজন পড়বে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে বলাবাহুল্য বটতলার একচক্ষু হরিণটির প্রয়োজন পড়বে। এযুগে একমাত্র সাহিত্য বটতলার সাহিত্য। যুগধর্মের তাড়নায় অশ্লীলতার কড়াপাকে বটতলা পরিপূর্ণ হলেও সেই একপেশে দৃষ্টিকে অস্বীকার করা যাবে না। যদিও বটতলার দৃষ্টি সমাজ সংস্কারে নয়—সমস্যাকে ভাঙিয়ে অর্থোপার্জন, তবুও বটতলা একক অনন্য। সংবাদপত্রের অগ্রদূত বটতলার এই সব বইয়ের plot-এ তাৎকালিক ঘটনার প্রভাব পড়েছে—সংবাদপত্রবিহীন কলকাতার সমসাময়িক ঘটনাগুলোর বিবরণ পাবার একমাত্র উপায় বটতলার বই।

অশ্লীলতার অপরাধে বটতলার সব বইকে অস্পৃশ্য করে রাখলে আমরা শুধু আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ক্রম-ধারা থেকে বিচ্যুত হব তাই নয়, transition period এর প্রধান ফসল যে ব্যঙ্গ সাহিত্য তার বিবর্তন ধারাও অনুসরণ করতে পারবো না এবং বাংলা নাটকের বিবর্তন যাঁদের পাঠ্য বা গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁরাও বটতলার গুদামজাত হাজার হাজার প্রহসনকে বিন্দুমাত্র অস্বীকার করতে পারবেন না। ডঃ সেনের ভাষায় 'উঁচু কপালে' দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা বটতলার বইকে

ঘৃণায় এড়িয়ে চলবেন তাঁরা এমনি অজস্র বিবর্তন ধারাও অনুসরণ করতে পারবেন না। বটতলার বইয়ের লেখকদের কথাও আলোচনা করা দরকার। এর মধ্যে বহু জ্ঞানী গুণীদেরও পাওয়া যাবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকই বটতলায় বই প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা রামমোহনের কয়েকটি বইও বটতলা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

বটতলার বইয়ের জগতে উপেক্ষিত চরিত্র তার প্রকাশকরা। শেক্সপীয়র রচনাবলীর প্রথম প্রকাশক জনডাক্টারকে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত বটতলার প্রকাশকদের নিয়ে কোন পৃথক আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

বটতলার প্রেসে ছাপা হলেও কয়েকটি দিগনিদর্শক বই এসে পরবর্তী কালে সমাজসংস্কারের ব্রত কাঁধে নিয়েছে। বলা বাহুল্য তা বটতলাকে ভাতে মেরেছে। বটতলা সমস্যাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে কিন্তু চাকে হাত দেয়নি। কিন্তু কয়েকজন সে পথ ত্যাগ করেছেন। বলা বাহুল্য কালের কুটিল স্রোত অবহেলা করে এদের কয়েকটি আজও টিকে রয়েছে এবং মজার কথা আজ আর তাদের গায়ে বটতলার দুর্গন্ধ নেই। কুলীনকুল সর্বস্ব, নবনাটক, সধবার একাদশী, জামাই বারিক, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ এবং সর্বোপরি হুতোম পেঁচার নক্‌শা প্রভৃতি বইগুলোকে আজ বটতলার বই বললে অনেকেই অসন্তুষ্ট হবেন। তবুও এই সব বড়লোক আত্মীয়ের হাত ধরেই যদি বটতলার সমগ্র পুস্তক সম্ভার সবার সামনে অনাহুত অতিথির মত উপস্থিত হতে পারে তাতে বিব্রত হবার কিছু নেই।

---

* বহু বিবাহের মতই বটতলায় অস্বাভাবিক বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহ উপেক্ষিত রয়ে গেছে। অসবর্ণ বিবাহ সাধারণতঃ প্রণয়ের পরিণাম। বটতলা অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন তো দূরের কথা প্রতিবাদও করেনি। এর বোধকরি প্রাথমিক কারণ বটতলা পণপ্রথার রোগের মূল সন্ধান করেনি, করতেও চায়নি।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

সৌহার্দ্যে রাজনীতির ছায়াপাত

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নি, কিন্তু অন্যান্য ভুলবোঝাবুঝির চেয়ে অনেক বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দূরত্ব রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধু রোটেনষ্টাইনের মধ্যে প্রায় অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করেছিল। প্রথম দিকে কিন্তু দুজনের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিনিময়ের কোনো প্রমাণ পাই না; অথচ পরের দিকে কেন তা এত প্রকট হয়ে উঠলো তা ক্রমশ আলোচ্য। প্রথম যে চিঠিতে ঘটনার উল্লেখ পাই সেটি (৩০ ডিসেম্বর ১৯১২) আর্বানা থেকে লেখা। দিল্লিতে বড়লাটের শোভাযাত্রাকালে সন্ত্রাসবাদী রাসবিহারী বসু ও তাঁর সঙ্গীরা হার্ডিঞ্জের হাতির উপর বোমা নিক্ষেপ করেন এবং লেডি হার্ডিঞ্জ আহত হন। এই ঘটনা বিদেশ থেকে জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে লেখেন—

The news of the outrage at Delhi has come to us with a great shock. The man who is too lazy for earning honest livelihood takes to burglery and only those who are disinclined to serve country with useful works and patient heroism try these violent and cowardly methods and bring down fearful nemesis upon their countrymen.

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই পেশাদার রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি বারবার রাজনীতির নিকট পরিমণ্ডলে এসেছিলেন কারণ তাঁর অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত স্বদেশের সামান্য অসম্মানেও তীব্র আঘাত পেতো। প্রথমবার বিলাতের দিগ্বিজয় অন্তে যখন রবীন্দ্রনাথ বন্ধুসমভিব্যাহারে বন্দরে এসেছিলেন ভারতযাত্রার পথে জাহাজে ওঠার জন্য, তখন তিনি জানতে পারলেন বাংলার বন্যার খবর বিলাতের সংবাদপত্রে ছাপা না হলেও জার্মান কাগজে ছাপা হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের নিকট তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। Manchester Guardian-এ এই ঘটনার মন্তব্য করা হয়েছিল,

We do not deserve his Gitanjali if we do not care about the people.

বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বাহ্নে ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগে যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজ জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ছায়াপাত হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডে অভূতপূর্ব সমাদর ও খ্যাতি অর্জন করায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যভূমিতে হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষের বেসরকারী দূত। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সেই পদে তাঁর প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদিত হলো। আপনা আপনি এসে গেল বিশ্বসভায় স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করায় দায়। দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনায় তাঁর মন যতই বিরূপ হোক, বাহিরের কাছে অপমানিত স্বদেশকে

সমর্থনের দায়িত্ব তিনি স্বভাবতই গ্রহণ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

Rabindranath personified to the West not only his poetry and his message, but also India.

এমন কি বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপকালেও তিনি হয়ে উঠলেন ব্যক্তির চেয়ে বড়ো, ভারত প্রতিনিধি। বন্ধুত্বের মধ্যে এই প্রতিনিধিমূলকতা এসে যাওয়ার কারণ, দুজনে ছিলেন এমন দুই দেশের নাগরিক, যার একটি শাসক, অপরটি শাসিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যেমন ভারত প্রতিনিধি মনে করেছেন, তেমনি ইংরেজ জাতির বা পাশ্চাত্য জাতির বিরুদ্ধে চিঠিতে অভিযোগ করার সময় রোটেনষ্টাইনকে ইংরেজ জাতির বা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধি হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাছাড়া যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে তিনি স্বদেশের বাণীমূর্তি বলে বিদেশে সম্মান পেলেন সেই পুরস্কারের ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কী পরিমাণ রাজনৈতিক কলুষাবর্ত ঘুলিয়ে উঠেছিল তা আমরা দেখেছি। অশ্বেতকায় জাতির লোকের পুরস্কার লাভে শ্বেতকায় জাতির যে কদর্য মূর্তি প্রকাশ পেয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মত স্পর্শকাতর মানুষের মনে রেখাপাত না করলেই অস্বাভাবিক হত।

ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল পর্যায়ক্রমে যে রবীন্দ্রনাথ এক দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইংরেজ জাতির বিচারবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা হারাতে বসলেন, এবং অন্যদিকে দুই দেশের তিক্ততা তাঁকেও স্পর্শ করলো। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যদিও তিনি আশা প্রকাশ করলেন,

আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তথাপি পাশ্চাত্যের যে জাতীয় অহমিকা এই আত্মঘাতী মারণযজ্ঞের জন্য দায়ী তাতে রবীন্দ্রনাথ হতাশ বোধ করেছিলেন। সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সর্বনাশা ভয়াবহতা যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার ক্রমান্বয় উন্নতির উনিশশতকী বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিল, আবার দেশের মধ্যে ছোটবড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকশাসিতের মধ্যে দূরত্ব বর্ধমান হলো। অধ্যাপক ওটেনের প্রহারেয় ঘটনায় তিনি 'ছাত্রশাসনতন্ত্র'কে যেমন নিন্দা করেছেন, তেমনি যে অপমানে উত্তেজিত হয়ে ছাত্ররা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছিল সেই অপমানে তিনিও বেদনা বোধ করেছিলেন। তারপর ছিল বর্ণবিদ্বেষ। জাপান হয়ে মার্কিনদেশে যাত্রার পূর্বাহ্নে (২৮ এপ্রিল ১৯১৬) তিনি রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন,

Doors are closing against us everywhere in the world. Indians going towards Japan or America are either disallowed or interned in Singapur.

পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন মহাযুদ্ধে নখেদন্তে ভয়াল হয়ে উঠেছে সেই সময় জাপানে রবীন্দ্রনাথ 'রণকণ্ডুয়নের ও সাম্রাজ্যস্ফীতির লক্ষণসমূহ' দেখে উত্তেজিত হয়ে জাতীয় অহমিকার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন; আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতামালার প্রধান বিষয়ই হলো 'Cult of Nationalism.'

We have felt its iron grip at the root of our life, and for the sake of

humanity we must stand up and give warning to all, that this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality.

যে পাশ্চাত্যসভ্যতা এই স্বাজাত্যবোধের জনক, রবীন্দ্রনাথের সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার নঞর্থক দিকের প্রতি দৃষ্টি পড়লো, অথচ তিনি উপলব্ধি করলেন সভ্যতার এই প্রলয়কালে প্রাচ্যের হাতেও সঞ্জীবনী নেই। তিনি মার্কিন দেশ থেকে ফিরে এসে লিখলেন (৬ জুলাই ১৯১৭)

I am afraid the West has lost its foothold of the inner life and has been hopping with one leg, revelling in the very jerkiness of its difficult movement because that has the appearance of power. Unfortunately the East has gone to the other extreme, and instead of using the inner life as the source of all harmonious movements has used it as a retreat for its practice of Liberation. But I, who have the amphibious duality of nature in me, whose food is in the west and breath air in the East, do not find a place where I can build my nest.

মার্কিনদেশে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর জন্য একদিকে যেমন তিনি পাশ্চাত্যে সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিলেন, স্বদেশেও তেমনি চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশনায়ক তাঁর তীব্র নিন্দাবাদ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে কবি জড়িয়ে পড়লেন। রাজদ্রোহের অপরাধে শ্রীমতী বেসান্ত অন্তরীণ হলে তার প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী বেসান্তের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। এই কথা কাগজে পড়ে কোনো ইংরেজ বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দেন এবং রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে যে খোলা চিঠি লেখেন সেটি রবীন্দ্রজীবনী-২তে উদ্ধৃত হয়েছে। যুবশক্তির উত্তেজনার কারণ তিনি দেখালেন ও শ্রীমতী বেসান্তের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের কারণও তিনি বিবৃত করলেন।

The constant conflict between the growing demand of the educated community of India for a substantial share in the administration of their country, and the spirit of hostility on the part of the Government, has given rise among a considerable number of our youngmen to methods of violence bred of despair and distrust (১)…what I consider to be the worst out come of this irresponsible policy of panic is the spread of the contagion of hatred against everything Western in minds which were free from it. In this crisis the only European who shared our sorrow, incurring the anger and derision of her countrymen, is Mrs. Annie Besant. This was what led me to express my greatful admiration for her noble courage.

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে ও সাধারণ সভায় পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ শাসকশক্তির চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন।

সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে ব্যাখ্যা করে এবং সাম্প্রতিক এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন (২৬ অক্টোবর ১৯১৭) তার থেকে উদ্ধৃত করছি,

I had my fear that my American lectures, especially those about nationalism, might give offence to my readers in England. Possibly to some extent they have done so……it seems to me that the word nation in its meaning carries a special emphasis upon its political character. Politics becomes aggressively selfconscious when it sets itself in antagonism against other peoples, specially when it tends its dominion among alien races. This convulsive intensity of consciousness is productive of strength but not of health. The rapid growth of nationaliam in Europe begins with her period of foreign exploration and exploitation. Its brilliance shines in contrast upon the dark back ground of the subjection of the other peoples. Certainly it is based upon the idea of competition, conflict and conquest and not that of co-operation.

এর পরের অনুচ্ছেদে তিনি স্বদেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে লিখলেন—

By some unexpected freak of fate I was caught in a duststrom of our politics. I have just come out of it nearly choked to death.

প্রত্যুত্তরে ১৯১৮-র আগষ্ট রোটেনষ্টাইন আশা প্রকাশ করেন (Speaight-এর জীবনী দ্রষ্টব্য), that Tagore would not allow the politicians to make use of him and uttered a warning against all forms of extremism.

যুদ্ধান্তে ভারত সরকার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিটি বসান, সেই কমিটি রৌলাট কমিটি নামে কুখ্যাত। এই কমিটি ভারতীয় দণ্ডবিধির যে সমস্ত সংশোধন সুপারিশ করে সেগুলি গ্রাহ্য হলে ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে এই আশঙ্কায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতিবাদ উপেক্ষা করে আইন পাশ হলো। গান্ধিজির আবেদনে হরতালের পর হরতাল হলো; শেষ পর্যন্ত যে পাঞ্জাবের অধিবাসী যুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরাজের স্বপক্ষে লড়েছিলেন সেই পাঞ্জাবে জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। হত্যাকাণ্ডের পর জঙ্গীশাসনে যে অপমান ও লাঞ্ছনা চললো তা আজ সুপরিজ্ঞাত। এবং সুপরিজ্ঞাত রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া—তিনি নাইট উপাধি (২) পরিত্যাগ করে উপদ্রুত দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। এতে শুধু 'Englishman'-এর সম্পাদকের মত চড়া সাম্রাজ্যবাদী চটলেন না যিনি লিখেছিলেন 'Whether this Bengali poet remained a Knight or a plain Babu' তার উপরে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে বিরূপ হলেন যাঁরা পৃষ্ঠপোষকের মনোভাব নিয়ে ভারতবন্ধু বলে নিজেদের দাবী করতেন।

এই ঘটনার পর ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন পুনরায় ইংল্যাণ্ডে গেলেন তখন দেখলেন

পূর্বের অনেক বন্ধুতায় শৈত্য প্রবেশ করেছে। রোটেনষ্টাইনের প্রাগুক্ত জীবনীকার স্পষ্টই লিখেছেন—

Tagore had returned to London in June 1920 but his visit was not a succes. Indian nationalism, fanned by the doctrine of self determination, was now moving into an acuter phase, and Tagore had his share in it.

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এই ভ্রমণের ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলতে যেয়ে এই জীবনীকার বিশেষ করে নাইট উপাধি ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও উপাধি ত্যাগের কারণটি সযত্নে গোপন করেছেন। যাই হোক এই জুন প্যাডিংটন ষ্টেশনে সপরিবারে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে Kensington Palace Mansion-এর বাসাবাড়িতে নিয়ে গেলেন, যে বাসাবাড়ি তিনিই রবীন্দ্রনাথের জন্য ভাড়া করে রেখেছিলেন। নৈশাহারে তিনি এলে পুরোনো বন্ধুদের খোঁজখবর নিতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ। পরের দিন সকালে কন্যাদের নিয়ে রোটেনষ্টাইন আবার এলেন ; দুই বন্ধুতে যে আলোচনা হল তার বিবরণ আছে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়—

Conversations turned on whether artists writers and intellectuals who were alive to the weaknesses of the government and resented its spirit of greed and exploitation should co-operate with it. Rothenstein evidently favoured co-operation ; he thought the intellectuals could not very well refuse to do their best, when they were appealed to by the state to help in the reconstruction of the country ; that the idea of 'service' was so deep-rooted in modern man, that his salvation lay through it, and that in the case of artists, specially, they could no longer depend for their living and the preservation of their art on the patronage of a few rich individuals ; since more and more the rich would have less surplus to spend on the arts. The artists therefore must work for democracy through the state. Father pointed out that artists, of all persons, must have absolute independence, that it is not healthy for them to be under any restraint.

দুজনের মতের দূরত্ব এই কথোপকথনের বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এবং মনে রাখা দরকার এই সংলাপের পশ্চাৎপটে বর্তমান জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও কবির প্রতিক্রিয়া। দুজনের মতপার্থক্যের অনেকটা কারণ পরিবেশগত। বিদেশীশাসনের চণ্ডনীতিতে দেশবাসী যেখানে অপমানিত সেখানে রবীন্দ্রনাথের বাস, স্বভাবতই তাঁর মনোভাব সরকার বিরোধী। অপরপক্ষে রোটেনষ্টাইন ১৯২০ সালের পর থেকে শাসক গোষ্ঠীর, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, Establishment তার অঙ্গ হয়ে উঠেছেন ক্রমেই। তিনি Royal College of Art-এর অধ্যক্ষ পদে ও শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Civic Art-এর অধ্যাপকপদে বৃত হয়েছেন, House of Commons-এর ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের জন্য সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছেন ; প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের বন্ধু তিনি, সম্রাট পঞ্চম জর্জের সামনে তাঁকে উপস্থিত করিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া

হয়েছে এবং সর্বোপরি তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে, যে নাইট উপাধি রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করে সরকারের বৈরী বলে গণ্য হয়েছিলেন। সুতরাং দুজনের মধ্যে মতে, ধ্যানধারণায় যে পার্থক্য দেখা দেবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তবু রোটেনষ্টাইন ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তাঁর বাড়িতে তিনি পূর্ববারের মতোই রবীন্দ্রনাথের জন্য সুধীসম্মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে দিলীপকুমার রায়ের গানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেখানেই হাঙ্গেরিয়ান বেহালাবাদিকা D' Aranyi-র সঙ্গে কবির পরিচয় হয়, যাঁর অনুপ্রাণিত বেহালাবাদনের কথা কবির স্মৃতিতে বহুকাল জাগরূক ছিল। কিন্তু অন্যেরা রাজনৈতিক মতভেদের জন্য ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। যেমন, অকস্‌ফোর্ডে কবির বক্তৃতাসভায় উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ পেয়ে রাজকবি ব্রিজেস এলেন না। তিনি লিখলেন (রবীন্দ্রজীবনী ৩ দ্রষ্টব্য),

…am sorry that I do not feel able to accept the invitation which I have just received, to speak at the meeting in Oxford on Friday (26 June, 1920). I am writing especially as I never sent any answer to your several communications since the last disturbances in India. I began a long letter, but I feared that you might misunderstand it even more than you could misinterpret my silence, and in England we could not at first rely on the press reports of events.

এর পর পার্লামেন্টসমূহের মাতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের আলোচনার ধরণে কবি মর্মাহত হলেন, যদিও ভারতসচিব মন্টেগু তাঁর উদারমনোভাবের জন্য কবির ধন্যবাদের পাত্র হয়েছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ড ত্যাগের পূর্বাহ্ণে রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন (৩১ জুলাই ১৯২০)—

It was fortunate for me to have been able to secure our lodging near your place and meet you once again as I believe this is going to be my last visit for this country. For I am growing old and things are changing fast making all communication difficult between different peoples.

যুদ্ধ ইউরোপ ভূখণ্ডে কবি সম্বর্ধনায় নন্দিত হলেন বিপুলভাবে। রাজনৈতিক কারণে অতি সম্প্রতি তিনি যে উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার পাশে রণবিধ্বস্ত ইউরোপের এই সাদর আহ্বান কবিকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল এবং ইংল্যাণ্ডের উপেক্ষা সেই কারণে বোধহয় কবির মনে আরো গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। ব্রাসেলস থেকে (৬ অক্টোবর ১৯২০) রোটেনষ্টাইনকে লেখা নিম্নোদ্ধৃত দীর্ঘ তীব্র চিঠিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে লিখলেন সম্বর্ধনার কথা—

The continual enjoyment of sympathy and fellowship with which I have been surrounded since I came to the Continent makes it difficult for me to sit down and write a letters. I can hardly realise how it has become possible

for me to have occupied the heart of these people to which I could only find access through a very meagre and imperfect medium of translation. The welcome which has been accorded to me in all the centres that I have travelled in Europe has been deeply genuine and generous to the extreme. This makes it delightfully easy for me to give out the best that I have in me in an easy flow of communication.

ইংল্যাণ্ডে যে মনোবিনিময়ের ধারা আর নাব্য নেই, ইউরোপে এসে দেখলেন সেই ধারা স্রাবল্যভাবে প্রবাহিত। তিনি লিখলেন, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁর স্বার্থশূন্য স্বাভাবিক সম্পর্ক, অথচ ইংরেজ জাতির সঙ্গে তাঁর সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না, মাঝখানে রাজনীতির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। তিনি জানালেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু যখন বিচারের পবিত্র তরবারি হত্যায় ব্যবহৃত হয় তখন,

I cannot say to myself, 'Poet, you have nothing to do with these facts, for they belong to politics.' This politics assumes its fullest diabolical aspect when I find it hideous acts of injustice find moral support from a whole nation only because it wants to enjoy in comfort and safety the golden fruits reaped from abject degradation of human races. What hurts me most is the fact that your people is ready to judge others while they shield themselves from the judgment of history by all means of moral camouflage, by obliteration of evidence of by misdeeds with scientific efficiency and farsightedness which were not within the means of our former rulers. But all the same judgment will come when the time is ripe; and because your politicians are conscious of the fact they are nervously busy in tightening their grasp upon the present situation, thinking that by doing so they will keep that future as their captive....But you must know that the downfall of your Empire is immient when the moral downfall of your people is proceeding in a rapid pace. It is right and natural that you will put more and more faith upon brute force for holding together your unwieldy Empire, making it so monstrously ugly that the whole outraged world will pull it down in disgust. Your bloated prosperity is a barrier that prevents you to see what beares of doom are silently marshalling their forces against you till the sudden signal is given from the dark.

রোটেনষ্টাইনকে উপলক্ষ করে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে তপ্তলাভাস্রোতের মত এই ক্রোধজ্বালাপূর্ণ অভিযোগ উদ্গীরণ করে কবি ভাষার তিক্ততার জন্য মার্জনা প্রার্থনা করেছেন। বৎসরব্যাপী নীরবতা পালনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এর পর মাত্র তিনটি চিঠি লিখেছিলেন, তৃতীয়টিতেও

(৮ মে ১৯২১) ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পাই।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ মার্কিনদেশে গেলেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে। এখন শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, সমগ্র অ্যাংলো-স্যাকসন বিশ্বে তিনি উপেক্ষিত। স্যার উপাধি ত্যাগ করায় ইংরেজ রাজশক্তি তাঁকে প্রতিপদে বাধা দানে নিযুক্ত। মার্কিনদেশে ব্রিটিশ শক্তির কাছে বাধা পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে মনে স্বভাবতই আরো বেশি তিক্ততা জন্মেছিল, এবং সেই তিক্ততা তিনি কিভাবে রোটেনষ্টাইনের কাছে প্রকাশ করেছিলেন সে প্রসঙ্গের অবতারণা পূর্বেই করেছি যখন ইংরেজ শক্তির ব্যবহারে তাঁর চিত্ত বিরূপ তখনো অথচ তিনি এনড্রুজকে লিখেছেন—

With all our grievances against English nation, I cannot help loving your country, which has given me some of my best friends.

মার্কিনদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইংল্যাণ্ড হয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় গেলেন ইউরোপ মহাদেশে—সেখানে পেলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সম্মান।

ফরাসীদেশে ও সুইডেনে জয়যাত্রা সমাপ্ত করে কবি এলেন জার্মানিতে এবং সেখানে দেখা গেল বীরপূজার চরম নিদর্শন। গেলেন অভিনন্দন মুখর ভিয়েনায়, গেলেন প্রাগে। ইউরোপ ভূখণ্ডে এই সম্বর্ধনার নানা কারণ অগ্রমিত হতে থাকলো এবং ফলে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকলো। এই বিজয়াভিযানের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে কৌতূহলী পাঠককে আরনসনের লেখা 'Rabindranath Through Western Eyes' গ্রন্থের 'Political Ambiguities' অধ্যায় পাঠ করতে হবে। একদিকে বাস্তবিকই জার্মানির জনসম্বর্ধনা অনেকাংশে রাজনৈতিক উদ্দেশে সংগঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে সেই সম্বর্ধনার মধ্যে সর্বদাই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কূটচাল খুঁজে বেড়াচ্ছিল —যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রাজনৈতিক জঙ্গলে রবীন্দ্রনাথের শুভ-ইচ্ছা এইভাবে দুই দিক থেকে শিকার হয়েছিল। ইউরোপের নগরভ্রমণকালে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক দপ্তর, রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা। জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রায় ইংল্যাণ্ডের শাসকবর্গ কোনো সময়ই সুখী ছিল না; সুকৌশল ইঙ্গিত, অস্পষ্ট গুজব এবং রয়টার প্রচারিত বিকৃত খবরের দ্বারা একটি রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াসে তারা ব্যস্ত হয়েছিল। যুদ্ধে যারা ছিল প্রতিপক্ষ, সেই ফরাসি ও জার্মান জাতি এখন রাজনৈতিক কারণে গ্রন্থাদি উপহার দিয়ে কবিকে তোষামোদ করতে আরম্ভ করলো। জার্মানিতে রবীন্দ্রপূজার চূড়ান্ত হল কাইজারলিঙের ডারমস্টাডস্থ 'School of Wisdom'-এ রবীন্দ্রসপ্তাহ পালনের সময়। একদিন (রবীন্দ্রজীবনী ৩ দ্রষ্টব্য),

চার হাজারের বেশি লোক একটা জায়গায় বনের ধারে টিলার উপর সমবেত হইয়াছে; কবি আসিলে তাহারা এক সঙ্গে গান গাহিয়া উঠিল; সে সব গান জার্মান লোকসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত।

আরনসন দেখিয়েছেন এই গান স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, অনেক দিন ধরে তার মহড়া দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠান জার্মানির জাতীয়তাবাদী দলগুলি নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। ১৯২১ সালেই নাজি পত্রিকায় প্রশ্ন উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ কি আর্য? উত্তরে বলা হচ্ছে,

He certainly is not Semitic race, and that would qualify him to wear a swastika, although his pacifism might give rise to suspicion.

১৯২৫ সালেও ইতালিতে তিনি উন্মত্ত সম্বর্ধনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—জেনোয়া ভেনিস মিলাম ব্রিন্দিসি Viva la Indian, Viva Tagore ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল এবং সেই অনুরাগের প্রদর্শনীও যে সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না তা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি।(৩) এর পর ক্ষমিকি ও তুচ্ছির প্ররোচনায় ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ইতালি ভ্রমণ করেন এবং কিভাবে মুসোলিনির চতুর আপাতঃ সৌজন্যে বিভ্রান্ত হয়ে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত হন, এবং অবশেষে কীভাবে রোঁলা প্রমুখ বন্ধু তাঁকে ফ্যাসিতন্ত্রের সত্যরূপ বুঝতে সাহায্য করেন তা সকলেরই জানা। রবীন্দ্রজীবনী ৩-এর ২৬৬ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ফ্যাসিতন্ত্রের সঙ্গে এই ক্ষণস্থায়ী বন্ধন সহজেই ছিন্ন হলো এবং হিটলারের প্রচারসচিব গোয়েবলস্ ১৯৩৭ সালে হুনেনবার্গের দলসমাবেশে স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে সমর্থনের জন্য তীব্রভাবে যখন বিশ্বের উদারপন্থীদের আক্রমণ করেন তখন অন্যান্য অগ্রণী উদারপন্থীর মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেন। এইভাবে দেশের গোঁড়া জাতীয়তাবাদী, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী সকলের আক্রমণের লক্ষ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বের প্রতি তাঁর বাণী হলো বিকৃত ব্যাখ্যা ও আক্রমণের বিষয়। এই প্রবণতা আরো উদ্দাম হলো যখন ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় অপাংক্তেয় রুশদেশে গেলেন। সেখানে 'ধন-শক্তিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব' দেখে রবীন্দ্রনাথের যে মুগ্ধতা তা স্বভাবতই সকলকে খুশি করেনি। বাংলা 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত সরকারী নিষেধাজ্ঞা তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়নি। কিন্তু ১৯৩১ সালের 'Modern Review'-তে একটি মাত্র চিঠি 'The Soviet System' নামে প্রকাশিত হলে, ভবিষ্যতে এই রচনা যেন মুদ্রিত না হয় বলে সম্পাদককে সতর্ক করা হয়। নিষেধাজ্ঞার অমান্য করে ১৯৩৫ সালে শশধর সিংহের করা আর একটি তর্জমা 'On Russia' নামে ছাপা হলে উক্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। কারণ এই রচনা, সহকারী ভারতসচিব বাটলার পার্লামেন্টে জানান,

Was clearly calculated by distortion of the facts to bring the British Administration in India into contempt and disrepute...

যাই হোক, বৎসরকালব্যাপী মনোভঙ্গের ফলে যে পত্রবিনিময় ধারা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুত্বের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মৌনের প্রাচীর, সেই প্রাচীর ভেঙ্গে বন্ধুত্বস্রোতকে পুনঃ প্রবাহিত করলেন প্রথম রোটেনষ্টাইন, যখন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের বন্দনায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তিনি লিখলেন (১ জুন ১৯২১),

I think it would be a pity if, travelling in triumph through Europe, you gave up for the praise of all men the affection of a single friend.

একজন বন্ধুর নিবিড় ভালোবাসা যে খেয়ালী জনতার সম্বর্ধনার চেয়ে মূল্যবান এই কথাও বোধহয় রোটেনষ্টাইন ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছিলেন। রোটেনষ্টাইনের চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর থেকে যেন এক গুরুভার নেমে গেল; দেশে ফিরে তিনি লিখলেন (১৩ জুলাই ১৯২২)

কেন ঐভাবে তীব্র আক্রমণাত্মক চিঠি তিনি বন্ধুকে লিখেছিলেন। বললেন, ব্রিটিশ প্রচারশক্তি বিশ্বভারতীর জন্য মার্কিনদেশে অর্থসংগ্রহে নানা উপায়ে বাধা সৃষ্টি করেছিল, এবং

I was in a bitter state of mind in consequence of this when your letter came to me with the suggestion that a board should be appointed in England with the object of selecting the students and lectures who were to come to us from the West.

এবং আরো লিখলেন—

But all this is not to discuss the subject but to offer you an explanation of my conduct. Now that is given it helps me to feel ashamed and sorry for having indulged in a fit of fretfulness so long and resume the natural thread of our friendship too precious to be allowed to weaken for any cause whatever. The interruption in our relationship has been growing a burden to me and I am deeply grateful to you for being the first to break it. When once an obstruction is formed in stream of communication which was natural and deep flowing it takes some time to discover how thin it is and made of debris that are casual and incongruous.

দেশে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটাতে যেয়ে, পাশ্চাত্যের বন্ধু হিসাবে তার দুর্বলতা দেখাতে যেয়ে, প্রাচ্যের মানুষ হিসাবে প্রাচ্যের সমালোচনা করতে যেয়ে, সর্বত্র তিনি বিক্ষোভ জাগিয়েছেন। ভাগ্যের এই পরিহাস সম্বন্ধে তিনি নিজেই যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে এই চিঠিতেই।

Our people in a fanatical mood of resentment were ready to repudiate the West altogether and any proposal of the co-operation with the Western humanity in any from was considered almost as an act of sacrilege. I made myself conspicuously hateful to my countrymen by protesting against such an irrational outburst of passion. It was an irony of fate which while it drew upon my venture (অর্থাৎ বিশ্বভারতী) the mighty power of suspicion of the British Government also aroused antagonism in my own people against it. The onslaught of non-cooperation fell on me from both the opposing sides.

কলম্বো থেকে লেখা (২০ অক্টোবর ১৯২২) পরবর্তী চিঠিতেও একই বক্তব্যের পুনরুক্তি পাই—

The time is not at all favourable in India for me to persuade our people of the importance of reconciliation of the East and West.

পাঁচ বছর পরে লেখা চিঠিতে (২০ এপ্রিল ১৯২৭) তিনি জানিয়েছেন অরাজনৈতিক বলে বিশ্বভারতীর কাজে তিনি স্বদেশে কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারছেন না;

বিরোধী পরিবেশের এই নিঃসঙ্গতা তাঁর পক্ষে দুর্বহ হয়েছে,

And I never pretend to say that I can dispense with human sympathy.

যে ইংল্যাণ্ড বিশ্বের দুয়ার তাঁর সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, যে দ্বীপে সমধর্মা কয়েকটি বন্ধু অর্জন করেছিলেন সেই ইংল্যাণ্ডের প্রতি আকর্ষণ তাঁর কমেনি; বারবার বলেছেন এই শেষ আগমন কিন্তু আবার তিনি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সেই ইংল্যাণ্ড শাসকের দেশ হওয়ায়, তিনি শাসিত জাতির মানুষ হওয়ায়, যে অনিবার্য রাজনৈতিক ব্যবধান দুইয়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তার জন্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ঔদার্যগুণে দূরত্বের দায় নিজে নিয়েছেন, কিন্তু দোষ ছিল অবস্থার। এই বিষয়ে তিনি রোটেনষ্টাইনকে ১৯২৬ সালে লণ্ডনে বাসকালে লিখলেন (৭ আগষ্ট)—

Unfortunately for me I have lost the place that I once chanced to gain in the heart of your country and today I feel that I merely drift on the current of a crowd, superficial existence that fires me every moment.

তারপর লিখলেন সর্বজয়ী বন্ধুত্বের কথা—

But one thing I have discovered lately that my love for you has sent its roots in the underground depth of my being and it is sure to survive all the changes of outward circumstance. My heart aches today when I remember our close and constant companionship in the early days of acquaintance so richly endowed by the unstinted generosity of your love. I am immensely thankful for this experience and also for the help you rendered unexpectedly in introducing Europe to me in whose shore, like a migratory bird, I have my second nest.

ইংল্যাণ্ডের হৃদয়ে যে আসন তিনি একদা তিনি লাভ করেছিলেন সে আসন হারানোর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করলেও তিনি যে দায়ী ছিলেন না তার প্রমাণ পাই যখন দেখি ১৯৩০ সালে শেষবার বিলাতভ্রমণের সময় শোলাপুরে গান্ধিটুপি পরার জন্য পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে, নিরীহ মানুষের উপর ইংরেজ শাসন কেমন 'cruel and arbitrary punishment' চাপিয়ে দেয় সে কথা বলতে হচ্ছে।

রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে সাবধান করেছিলেন, প্রবক্তার পথে অনেক প্রলোভনের ফাঁদ। রবীন্দ্রনাথ জর্জরিত বিশ্বকে রোগমুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ ও বাণীকে সেই উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরেছিলেন, কারণ মানুষের শুভবুদ্ধির উপর ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। বর্তমান বিশ্ব সেই সহজ আশাবাদের কতদূর পরিপন্থী তা তিনি দীর্ঘকাল বুঝতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডে সন্দেহের রাজনীতি, ইউরোপ সঘর্ষনার মধ্যে রাজনীতি, মার্কিনদেশের গুজব ও কৃপণতা, দেশে বিরোধী পরিবেশের নিঃসঙ্গতার সমুখীন হয়ে কবি শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন; প্রবক্তার ভূমিকা পরিত্যাগ করতে উন্মুখ হয়ে তিনি ১৪ এপ্রিল ১৯২৬ তারিখে রোটেনষ্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে যেন ওথেলোর হতাশ হাহাকারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

With the breaking down of my health I have lost my occupation while gaining back the leisure which constantly reminds me of the natural field of my life now lying buried under the debries of my work. It brings today to my memory all the surprises of that fruitful time of rich idleness, that apic era of divine inutility to which your thoughts belong so intimately.

অপচয়িত দিনগুলি যেসব কারণে তিনি ব্যয় করেছেন সেগুলি আবর্জনাস্তূপের মতো পড়ে আছে অথচ মানুষের কল্যাণের সম্ভাবনায় এখনো তিনি দেশে দেশে ভ্রাম্যমান, শুভবুদ্ধির জাগরণে এখনো উৎসুক; অথচ তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে জেনিভা থেকে রোটেনষ্টাইনকে লিখছেন (২৪ আগষ্ট ১৯৩০)—

The rich luxury of leisure is not for me while I am in Europe—I am doomed to be unrelentingly grod to humanity and remain harnessed to a cause. The artist in me ever urges me to be naughty and natural—but it requires good deal of courage to be what I truly am.

রাজনীতিতে তিনি ক্রমেই নিস্পৃহ হয়ে উঠছেন, এই নিরাসক্তির প্রমাণ শান্তিনিকেতন লেখা ২৪ মার্চ ১৯৩১ তারিখের চিঠির কয়েকটি বাক্যে—

You will be surprised to learn that I hardly know anything about the recent political development in India I do not read newspapers for I have my own work which I consider to be important and I cannot allow my minds to be waylaid by discussions that are outside my scope.

প্রবক্তার ভূমিকা ত্যাগ করে যেমন তিনি শিল্পীর স্বধর্মে ফিরে এলেন, তেমনি সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধের উর্ধ্বে মূল্য দিলেন বন্ধুকে, বন্ধুত্বকে। দার্জিলিং থেকে লেখা চিঠির (২৯ জুন ১৯৩১) পুনশ্চে যা লিখলেন তার মধ্যে পাই ক্ষমাপ্রার্থনার সুর, রাজনৈতিক কারণে যত ভুলবোঝাবুঝি জমেছিল তাঁর সমস্ত চিত্তম্লানিকে মুছে দিতে চেয়েছেন—

I know that during my contact with you I occasionally displayed moods must have caused you pain, but I hope you realise that they never represented my deeper normality, that they were proved by some jerks of time which for the moment was passing over a road badly out of repairs.

রোটেনষ্টাইনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব 'jerks of time'-কে অতিক্রম করতে পেরেছিল; সেই বন্ধুত্বের কী মূল্য তাঁর কাছে ছিল তার প্রমাণ পত্রাবলীতেই বর্তমান।

১। পূর্বোদ্ধৃত একটি চিঠিতে বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপের জন্য রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদীদের নিন্দা করেছিলেন। এখানে তিনি সন্ত্রাসবাদের সত্য কারণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অনেক পরবর্তী একটি চিঠিতে (১৫ নবেম্বর ১৯৩১) তিনি রোটেনষ্টাইনকে সন্ত্রাসবাদের জনক যে দমননীতি এই কথাই বলেছেন—'A very long period of suffering is

before our people, the continual strain of which is sure to drive a number of our youngmen to desperate deeds of violence creating a vicious circle of an alternate repression and defiance.'

২। পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে ৩ জুন ১৯১৫ তারিখে তিনি নাইট উপাধি পান এবং পেয়ে রোটেনষ্টাইন-তনয়া রাচেনকে ২ জুলাই ১৯১৫ তারিখে লেখেন (Speaight-এর জীবনীতে উদ্ধৃত). তাঁর সম্মানপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ হবে না 'till I go to Far Oakridge to receive my homage from the dear maidens who dwell by the pinewood nursing baby rabbits. Keep my wreath of wild roses for the next summer when I shall alight from my milk-white horse at your gate and blow upon my horn three times. I hope all your baby pets will grow up sufficiently by that time to allow you some leisure for your Knight, who, of course, cannot pretend to have the same claim upon your attention as the immature rabbits.'

৩। অসুস্থ অবস্থায় মিলন থেকে রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন (২৭ জানুয়ারি ১৯২৫)— 'I have fallen ill. I almost feel guilty that it should have been so—for I have been met with such an outburst of welcome that it grieves my heart not to be able to respond to it in an adequate manner. Twice I have been able to appear before the public and the enthusiasm of the people has made me feel humble—I only wish I could do something to them to deserve this.'

কবি দান্তে

সত্যভূষণ সেন

ইওরোপের সাহিত্যে হোমার এবং ভার্জিলের পরেই দান্তের স্থান, কালানুক্রমিক হিসাবে তার পরে আসেন শেক্সপীয়ার, মিল্টন এবং গ্যেটে, হোমার গ্রীক সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয়, যেমন ভার্জিল ল্যাটিন সাহিত্যের। দান্তের জন্ম তেমন কোনও সমৃদ্ধ ভাষা তৈরী ছিল না; যে ভাষা তার মাতৃভাষা তা ছিল ইতালী দেশের অপর কয়েকটি জনপদ ভাষার অন্যতম। দান্তের প্রতিভাপ্রসাদে সেই ভাষাই সমৃদ্ধ হয়ে কালক্রমে নিখিল ইতালীর ভাষা হয়ে দাঁড়ায়, সেই ভাষাই এখন ইওরোপের সাহিত্য সংসারে ইতালীর ভাষা বলে পরিচিত। দান্তের প্রতিভার এ অবদানও বিশেষ লক্ষণীয়।

দান্তে ছিলেন ফ্লোরেন্স নগরীর অধিবাসী, এ জন্য কবির গর্ববোধের অন্ত ছিল না। আবার তার সমগ্র জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই ঘটনাই ছিল তাঁর জীবনের সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের মূলীভূত কারণ—যে তিনি সে সময়ে এই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে সমগ্র ইতালীব্যাপী কোন সার্বভৌম রাজা বা রাজত্ব ছিল না। কিন্তু ফ্লোরেন্স তখন দেশের অপরাপর নগরের ন্যায় একটি সাধারণ নগরী মাত্র ছিল না; ফ্লোরেন্স তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি স্বতন্ত্র যেন একটি সার্বভৌম বস্তু; তার নিজস্ব জাতীয় পতাকা ছিল, সেনাবাহিনী ছিল, অনেক দেশে এই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দূত ছিল, বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল এবং নিজস্ব মুদ্রা; ফ্লোরেন্সের এই মুদ্রা ফ্লোরিন কালে কালে ডলার এবং পাউণ্ডের ন্যায় দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মুদ্রা হয়ে দাঁড়াল।

ফ্লোরেন্সের মত এমন একটি নগর রাষ্ট্রের অধিকার লাভ সকলেরই কাম্য হতে পারত। এই স্বাধিকার লাভের কামনায়ই দেশের দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। দুর্গসম নিজ নিজ প্রাসাদে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারণগোষ্ঠী ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর দল ঘিবেলাইন, তাদের প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় তাদের দম্ভের সীমা ছিল না। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গুয়েলফ যখন তাদের বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিভার প্রভাবে অভূতপূর্ব বলের অধিকার লাভ করতে লাগলেন তখন তারা অভিজাত সম্প্রদায়ের দম্ভ এবং প্রাধান্য সহ্য করতে পারলেন না। একটি নারীর প্রতি ব্যক্তিগত অত্যাচার কাহিনীকে উপলক্ষ করে যে কলহের সৃষ্টি হয় তাই গিয়ে দাঁড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সংঘর্ষের ইতিহাসে গুয়েলফ এবং ঘিবেলীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘর্ষ, বার বার ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে ১২৬০ সালে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে গুয়েলফরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ছয় হাজার লোক নিহত এবং ষোল হাজার লোক বন্দী হয়ে যায়, ফ্লোরেন্সের অস্তিত্ব যেন বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু গুয়েলফরা আবার শক্তি সংগ্রহ করে ১২৬৬ সালে শেষবারের মত শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

এই ঘটনার পূর্ববর্তী বৎসরে ১২৬৫ সালের মে মাসের শেষভাগে দান্তের জন্ম হয়, নিম্ন অভিজাত এবং সাধারণ নাগরিক পরিবারের মিশ্রণের ফলে দান্তে ছিলেন গুয়েলফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পরিবারও নিশ্চয়ই নিজেদের দলের এই বিজয়ের উৎসবে অংশ গ্রহণ করে থাকবেন।

দান্তের মত সংবেদনশীল শিশুচিত্তে সাম্প্রতিক বিগত কালের যুদ্ধ জয়ের নানাপ্রকার কাহিনী নানাভাবে রেখাপাত করে থাকবে; যার পরিচয় পাওয়া যায় তার মহাকাব্যের প্রথম দুই খণ্ডের স্থানে স্থানে—The Divine Comedy, The Inferno, The Purgatory.

দান্তের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিবরণ অল্পই পাওয়া যায় যেমন তাঁর সমসাময়িক লেখক বোকাচিওর ক্ষেত্রেও অনেকটা কিম্বদন্তী এবং শোনা কথার উপরে নির্ভর করতে হয় এবং কিছু কিছু অনুমান বা সিদ্ধান্ত করে নিতে হয় তার কাব্য সাহিত্য থেকে। অতি অল্প বয়সে মাতার মৃত্যুর পরে তাঁর পিতা আবার বিয়ে করেন, ফলে পিতা মাতার স্নেহ বাৎসল্যের জন্য তাঁর স্বাভাবিক কামনা অতৃপ্ত থেকে যায়, তাঁর কিছু কিছু পরিচয় তাঁর মহাকাব্যে The Divine Comedy থেকে খুঁজে বার করা যায়। তাঁর স্তরের সাধারণ পরিবারের সন্তানদের মত শিক্ষা তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন এবং সম্ভবত তার চেয়ে কিছু বেশিও, কারণ তাঁর অন্তরে মননশীলতা এবং সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় ছিল নিঃসন্দেহ। তিনি কিশোর বয়সে যে সকল কবিতা রচনা করেছিলেন তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে অল্প বয়সেই নিজ ভাষার গীতি কবিতার প্রতি তাঁর আগ্রহ বোধ ছিল, যে ভাষা ছিল বহুল পরিমাণে প্রভেনকল ভাষার নিকট ঋণী। এই সাহিত্য অনুশীলনের ফলেই তাঁর কতকটা অগ্রজ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ক্যাভালকান্তির সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সূত্রপাত।

দান্তের যৌবনকাল সম্পর্কে অমরা যতটা ধারণা করে নিতে পারি তাঁর অধিকাংশই সংকলিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে—১২৯২ সালে রচিত La Vita Nuava—The New Life. দেশীয় ভাষায় রচিত এই কাব্যগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনায় কবি ক্যাভালকান্তির অনেকটা অংশ ছিল। এই কাব্যের ভিত্তির মূলে ছিল তাঁর জীবনের বাল্যকালের এমন একটি ঘটনা যা তাঁর জীবনে তখনই এমন রেখাপাত করে যার প্রভাব তাঁর সমস্ত জীবন থেকে কখনও বিলীন হয়ে যায়নি। এই ঘটনার স্মৃতি তাঁর সমগ্র জীবনকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করে এবং তারই পরিণতি ফল তাঁর মহাকাব্য The Divine Comedy. এই ভিটা নুওভা কাব্যের মধ্যে ছিল কতকগুলি সনেট এবং বহু বৎসর পূর্বে যে অবস্থার মধ্যে এই সকল কবিতা রচিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা হিসাবে সংযোগসূত্র স্বরূপ কিছু গদ্য রচনা আমাদের দেশের সাহিত্যে যেমন চম্পূ কাব্য।

দান্তে যখন নয় বছরের বালক তখন কোনও স্থানে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে একটি বালিকার উপরে যার বয়সও ছিল নয় বছরের কাছাকাছি। কাব্য সাহিত্যে এবং সাংসারিক জগতেও প্রথম দম্পতি প্রেমের কথা বহু প্রচলিত; এ শুধু প্রেম নয়, এ যেন সম্মোহন সুন্দর বা অসুন্দর কোনও বিচারবুদ্ধি হয়তো তার মনেও ওঠেনি, তিনি বালিকাকে দেখে অতিমাত্রায় মুগ্ধ যেন একবারে সম্মোহিত হয়ে পড়লেন, তার চিত্তে এই বালিকার সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি যে রেখাপাত করল তা আর কখনও বিলীন হল না। দান্তের বয়স যখন আঠার বৎসর তখন এই বালিকার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ হয় এবং হয়তো আলাপ পরিচয় সূত্রে সামান্য কথাবার্তাও হয়ে থাকবে, তার বেশি নয়। এই বালিকার নাম ছিল রিচে পোর্ত্তিনারি কিন্তু এই নাম দান্তের মনোমত না হওয়াতে তিনি এর নামকরণ করলেন বিয়াত্রিচে এবং দান্তের জীবন এবং তাঁর কাব্য সাহিত্যে সম্পর্কে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে রইলেন। সকল ঘটনা জানা যায় না। কিন্তু

দেখা যায় যে যথাকালে অপর একজন অভিজাত বংশের যুবকের সহিত বিয়াত্রিচের বিয়ে হয়ে যায় এবং অনতিকাল পরেই তার মৃত্যু ঘটে, যখন তার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই ঘটনায় দান্তের মত সংবেদনশীল কবিচিত্তে যে কত মর্মন্তুদ বেদনার অনুভূতি জেগেছিল তা কল্পনার বিষয়। দান্তের বয়স যখন সাতাশ বৎসর তখন আর একবার দেখতে দেখতে পেলেন তার বিয়াত্রিচের অলৌকিক মূর্তি—স্বপ্ন কল্পনায় অথবা দিব্য দৃষ্টিতে এই একবার মাত্র। তার পর থেকে কবি এবং প্রেমিক চিত্তের কল্পনা অনুভূতি ছাড়া দান্তের জীবনে বিয়াত্রিচের আর কোনও যোগাযোগ দেখা যায় না। দান্তে বিয়াত্রিচের প্রেম কাহিনী প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত। এই প্রসঙ্গে অংগীয় যে ইতালী দেশেরই আরও তিন জন কবি বা সাহিত্যিকের কথা তাদেরও প্রত্যেকের জীবনে একটি নারী আবির্ভূত হয়ে অনুরূপ প্রেম কাহিনীর সৃষ্টির কারণ হয়েছিল এবং তাদের জীবনে বিবিধ রেখাপাত করেছিল; পেত্রার্কের লরা, বোকাচিওর ক্ষেত্রে ফিয়ামেত্তা এবং ট্যাসের লীওনোরা।

দান্তে যেমন ছিলেন অনুভূতি পরায়ণ এবং সংবেদনশীল কবিচিত্তের অধিকারী তেমনই তিনি আবার ছিলেন ঘোরতর বাস্তববাদী। বিয়াত্রিচে সম্পর্কে ভাবাবেগের নিদারুণ আতিশয্যেও তিনি নিঃশেষে অভিভূত হয়ে পড়েননি। দেখা যায় ১২৮৯ সালে তিনি যুদ্ধযাত্রায় এবং দেশ জয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের সূত্রপাত হয় ১২৯৫ সালে নানা কর্মচেষ্টার পরে ১২৯৯ সালে তিনি একটি রাজপ্রতিনিধি দূতের পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে জেমা নামে এক তরুণীকে বিয়ে করেন, যার এক ভাই ছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ফোরেসে দোনাতি এবং অপর এক ভাই কর্সো দোনাতি।

তারপরেই দেশে আবার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জেগে ওঠে। এবারও একটি ব্যক্তিগত খুনের ঘটনা উপলক্ষ করে সংঘর্ষ ঘটে। ১৩০০ সালে সাদা এবং কালো দুই দল নগরের পথে পথে যুদ্ধ করে। এই সময়ে দান্তে রাজনীতি ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন, ছয় জন সর্বোচ্চ শাসনকর্তার একটি পদে তিনি নির্বাচন লাভ করেন। তাঁর এই দুই মাস কাল পদাধিকারের মধ্যে তাঁর দু'জন আত্মীয় বন্ধুর নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞায় তিনিও সমর্থন জানাতে বাধ্য হন—তাঁর শ্যালক কর্সো দোনাতি এবং প্রথম বন্ধু ক্যাভালকান্তি, যারা ছিলেন যথাক্রমে কালো এবং সাদা দলের নেতৃস্থানীয়। এই নির্বাসনের অতি অল্পকালের মধ্যেই রোগে পড়ে ক্যাভালকান্তির মৃত্যু ঘটে।

'কালো' দল তখন গিয়ে পোপের শরণাপন্ন হন, তিনি যেন যথাযোগ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। পোপ উল্লসিত হয়ে উঠলেন, তাঁর আশা হল যে এই সূত্রে টাসকানি প্রদেশে তার আধিপত্য গড়ে উঠতে পারে। তিনি চার্লস নামক তাঁর মনোনীত এক ব্যক্তিকে পাঠালেন ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য। পোপের গোপন নির্দেশ কি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন চার্লস এসেই (১৩০১ সালের নভেম্বর) নির্বাসিত কালোদের দেশে ফিরে আসবার অনুমতি দিলেন এবং সাদাদের উপর নির্যাতন শুরু করলেন। দুর্নীতি প্রভৃতি অপরাধের জন্য যাদের উপর দণ্ডাজ্ঞা হল তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দান্তে। তাঁর উপরে দণ্ড বিধান ছিল জরিমানা, অনাদায়ে প্রাণদণ্ড। দান্তে তখন অন্যত্র ছিলেন, জরিমানা যখন এসে পৌঁছল না তখন আদেশ হল দান্তেকে

ধরে আনতে পারলে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। ফলে ১৩০২ সালের প্রথম থেকেই দান্তে স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে রইলেন।

নির্বাসিত জীবনে এসে পড়লেন দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের অনিশ্চয়তার মধ্যে। তাঁর অর্থসম্বল তো ছিলই না। তেমন নির্ভর যোগ্য অর্থপ্রতিপত্তিশালী বন্ধুও কেউ ছিল না, তখন পর্যন্ত তাঁর কবি খ্যাতি লাভ হয়নি। ইতালীর বিভিন্ন স্থানে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি অভিজাত পরিবারের আশ্রয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়; বলা হয় যে এরই মধ্যে কোনও সময়ে তিনি প্যারিসে এমনকি অক্সফোর্ডে গিয়েও অধ্যয়ন করেছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটে র‍্যাভেনার এক বিশিষ্ট পরিবারের সম্মানিত অতিথি হিসাবে। এই সময়টা অপেক্ষাকৃত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ তাঁর জীবনে ঘটেছিল। এখানে থেকেই তিনি কোনও রাষ্ট্রনৈতিক দৌত্যকার্যে প্রেরিত হয়েছিলেন ভেনীসে। সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বস্থানে ফিরে আসার পরেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। নির্বাসন কালের এই উনিশ বৎসরের জীবনের দুঃখকষ্ট দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা যে কি নিদারুণ হয়েছিল, বিশেষতঃ তাঁর মত একজন সংবেদনশীল কবির পক্ষে তাঁর আভাস পাওয়া যায় তাঁর কাব্য গ্রন্থে ভিভাইন কমেডি, প্যারাডাইস ১৭শ খণ্ডে—পরান্নগৃহীত অন্ন গ্রহণ এবং পরের ইচ্ছার অনুসরণে পথ চলার দুর্ভাগ্যের কথা।

দান্তে শুধু একজন সংবেদনশীল কবি ছিলেন না, তার উপরে তিনি ছিলেন একজন অধ্যয়নপরায়ণ এবং মননশীল দার্শনিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ভিটা নুওভা রচনার কিছুকাল পরে থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত তিনি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন, তার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন যে মানুষের জীবনের সুখ শান্তি লাভের পথে প্রধান বাধা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অরাজকতা। তিনি তখন 'সাদা', 'কালো', 'ঘুয়েলফ', 'ঘিবেলীন', সকল দলের সংস্রব ত্যাগ করলেন। তিনি ধারণা করে নিলেন যে তিনি নিজেই স্বতন্ত্র একটি দলের প্রতিভূ বা প্রতীক। তিনি বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। ল্যাটিন সাহিত্যে এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত সকল গ্রন্থ—প্ল্যাটো, সিসেরো, ভার্জিল, ওভিড, হোরেস, স্ট্যাটিয়াস প্রভৃতি। তাকে সাহায্য করবার জন্য কোনও শিক্ষাদাতা ছিল না, গ্রন্থাদি সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেনওনি। তিনি একজন শিক্ষিত লোক, তথাপি তাঁর পক্ষে সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট উপলব্ধি কতকটা কঠিন বোধ হত; তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন যে আরও যে সকল লোক এসব অধ্যয়ন করতে আগ্রহান্বিত, তাদের মধ্যে যাদের তাঁর নিজের মত জ্ঞান বুদ্ধি বা মননশীলতা নেই তাদের পক্ষে এসকল অধ্যয়নে চূড়ান্ত ফল লাভ করা আরও কত কঠিন।

দান্তে আরও উপলব্ধি করতে লাগলেন যে এসব বিষয়ে জনগণের শিক্ষাদানের কোনও ব্যবস্থা নেই। কে এই দায়িত্বভার নিতে পারে? এক আছে চার্চ; তারা নেবেন না, কারণ তারা গতানুগতিক ভাবে কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলেছেন, জনগণের সুখশান্তির জন্য যে এসব প্রয়োজন সে বিষয়ের প্রাধান্য স্বীকারের কথা ভাবতেও তারা অভ্যস্ত নন। এই ব্যাপারটা দান্তের নিকট একটা সমস্যা বলে মনে হল। তখন তিনি ভাবলেন যে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত তাঁর সকল

অধ্যয়নের ফল এবং সকল সমস্যা নিয়ে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করবেন। এই গ্রন্থে তাঁর সকল অধ্যয়ন ও মননের সকল ফলাফল সপ্রকাশিত এবং সংগ্রথিত থাকবে এবং ল্যাটিন ভাষায় না লিখে তিনি এই গ্রন্থ লিখলেন দেশীয় ভাষায় যাতে জনসাধারণও এর মর্মগ্রহণে সমর্থ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশীয় ভাষায় বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনার কল্পনা ছিল অনেকটা বিদ্রোহ বিপ্লবের মত ব্যাপার। এই থেকেই বোধ হয় দেশীয় ভাষার প্রথম মর্যাদা লাভ ঘটল, এই ভাষারই পরিণতি ফল বর্তমান ইতালীয় ভাষা। এই ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে দান্তে তখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন —এক নতুন আলোকের আবির্ভাব, এক নতুন সূর্য্যের অভ্যুদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন অতিপরিচিত সূর্য্যের ল্যাটিন ভাষার অস্তগমন; ল্যাটিন ভাষা জনসাধারণকে আলোক দান করতে পারেনি, এই নতুন ভাষা তাদের পথ প্রদর্শন করবে। দান্তের সেদিনকার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

'ব্যাঙ্কোয়েট' নামে এই পরিকল্পিত গ্রন্থে থাকবে পনেরোটি খণ্ড, প্রথম খণ্ডে ভূমিকা এবং অবশিষ্ট চৌদ্দটি খণ্ডে তাঁর বক্তব্য দর্শনের কথা থাকবে কাব্যে গ্রথিত; প্রত্যেক খণ্ডের শেষে থাকবে গদ্য ভাষায় ব্যাখ্যা রচনা। এই গ্রন্থের প্রথম চারটি খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় আর অগ্রসর না হওয়ার পক্ষে দুটি কারণের কথা বলা হয়; প্রথমতঃ রচনা কবির নিজের নিকট আশানুরূপ সার্থক বলে বোধ হয়নি, কতকটা যেন মধ্যযুগসুলভ অস্পষ্টতা তার মধ্যে রয়ে গেছে; দ্বিতীয় কারণ এই গ্রন্থে দর্শনতত্ত্বকে একপ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে সেটাকে সেযুগে প্রচলিত ধারণার পক্ষে বিদ্রোহই বলা চলে, এতে সামাজিক ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে, সকল দিকে বিবেচনা করে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন, কোনও দিকে যেন পথ দেখতে পেলেন না। তাঁর এই সময়কার মনোভাবই যেন তাঁর প্রধান কাব্য ভিভাইন কমেডির প্রস্তাবনায় অন্ধকার বনভূমি বলে চিত্রিত হয়েছে।

দান্তে যে সে সময়কার সমাজ জীবনের নানাপ্রকার দুর্নীতি এবং তাঁর ফলে অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার পরিচয় রয়ে গেছে এই 'ব্যাঙ্কোয়েট' কাব্যের মধ্যে। কিন্তু তাঁর দর্শন মতবাদের পূর্ণ বিস্তৃতি দেখা যায় তাঁর সেই সময়কার শেষ গ্রন্থে 'দে মনার্কিয়া।' তাঁর তত্ত্বপ্রচারক গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থই ছিল সর্বসম্পূর্ণ এবং সুগঠিতও বটে। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এই গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় রচিত। নানা দিক বিবেচনা করে তিনি এইটেই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। দান্তের কয়েক বৎসর পরে পোপের নির্দেশে এই গ্রন্থ খুঁজে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই সময়ে ক্ষীণবল সম্রাটের আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা চলছিল। তারা প্রচার করেছিলেন যে চন্দ্র যেমন সূর্যের উপর নির্ভরশীল তেমনই রাজাও পোপের উপর নির্ভরশীল। 'দে মনার্কিয়া' গ্রন্থে অগ্রাহ্য করে দান্তে বললেন যে রাজা এবং পোপ উভয়েই স্ব স্ব প্রধান যেন সূর্য এবং তারা। উভয়েই একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ের লক্ষ্য মানুষের জন্য ইহজগতে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে আত্মার মুক্তিসাধন। সেকালের সেই ধর্মীয় অনুশাসনের যুগে দান্তের স্বচ্ছ স্বাধীন মতবাদের মূল্য উপলব্ধি করবার মত মনোবৃত্তির অভাব ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের কষ্টি পাথরে দান্তের মতবাদের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

দান্তের 'দে মনার্কিয়া' গ্রন্থের যেরূপগতিই হয়ে থাক তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কারণ

এই গ্রন্থের মূল ভাবনা চিন্তা প্রায় সবই তাঁর অমর কাব্য 'ডিভাইন কমিডি'তে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে বিধৃত হয়ে রয়েছে কোথাও স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে কোথাও বা অন্য প্রসঙ্গের সহিত জড়িত হয়ে। সেই হিসাবে তাঁর 'ব্যাঙ্কোয়েট' কাব্যগ্রন্থ যে অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল তার জন্যও দুঃখ করবার কারণ নেই, তাঁর যত অর্জিত বিদ্যাসম্পদ এবং মননশীলতা যা তিনি সুষ্ঠু সুন্দরভাবে প্রকাশ করে উঠতে পারছিলেন না, তাও 'কমিডি' গ্রন্থে প্রত্যয়সিদ্ধরূপে অপরূপ গরিমায় প্রকাশ লাভ করেছে। এমনকি বিয়াত্রিচের সহিত তাঁর প্রেমের ভাবাবেগের অনুপ্রেরণা তাঁর কিশোর বয়সে রচিত কবিতাগুলি গ্রথিত করে তাঁর প্রথম জীবনের যে সুচারু কাব্যগ্রন্থ 'ভিটা নুওভা' তাও যেন তাঁর 'ডিভাইন কমিডি' কাব্য গ্রন্থে প্রসারিত হয়ে গরিমাময় রূপ লাভ করেছে। যেখানে 'পারগেটোরি' পর্বতের স্বপ্রদেশে এবং শীর্ষদেশে বিয়াত্রিচে এসে দেখা দিলেন এবং দান্তেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। এই মহাকাব্যের মধ্যে কবির সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান সম্পদ, তাঁর সমীক্ষা নিরীক্ষা ধ্যান ধারণা এবং তাঁর সমস্ত জীবনের সকল অভিজ্ঞতা যেরূপ সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাও এক পরম বিস্ময়ের বিষয়।

দান্তের সমগ্রজীবন যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখদুর্গতিরও কাহিনী, নিদরুণ জীবনঅভিজ্ঞতার দুঃস্বপ্ন যেন একটা ট্র্যাজেডি। কিশোর বয়সে তাঁর জীবনে যে প্রেমের আবেগ অনুভূতি এবং মোহময় স্বপ্ন কল্পনা এসে দেখা দিল, তাঁর সার্থকতা লাভ দূরে থাক, অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, কিন্তু তাতে তাঁর জীবনে যে রেখাপাত করে গেল তার কখনও বিলুপ্তি ঘটে নি। পরবর্তী জীবনে তিনি পত্নী গ্রহণ এবং সন্তান লাভও করেছিলেন বটে কিন্তু দাম্পত্য জীবনের বা পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি লাভ তাঁর অদৃষ্টে ঘটে নি। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে বহুকালব্যাপী যে যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল তাঁর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ তাঁর জীবনের অর্ধেককাল কেটে গেল দুঃখ বিপাকের অভিজ্ঞতায় জর্জরিত অবস্থায়। তার পরের অভিজ্ঞতা আরও নিদারুণ; রাজনীতির বিপর্যয় সঙ্কটে তার অদৃষ্টে ঘটল দেশ থেকে চির নির্বাসন, ফলে তাঁর সমগ্র জীবন যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল কিন্তু তাঁর জীবনের ব্যাপক এবং গভীর দুঃখ দুর্গতির অভিজ্ঞতায়ও তার প্রাণশক্তি এবং তার প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তিনি দেখতে পেলেন, রাজনীতির বিপর্যয়ের ফলে দেশের সমাজজীবনও নানা দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত, তাতে আবার ইন্ধন যুগিয়েছে রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সমাজজীবনের এই সকল সঙ্কট সমস্যার সমাধান কল্পে দান্তে অধ্যয়ন মনন গবেষণা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ হল না। সর্বাপেক্ষা তাঁর এই মহাকাব্য রচনা যেন তাঁর সমগ্র জীবনের এবং মানস জগতেরও সকল দুঃখ জ্বালায় অগ্নি দহনের পরিশুদ্ধির পরিণতিতে ফুটে উঠল তার জীবনসাধনার এই সার্থক সৃষ্টি। দান্তে এই কাব্যের নামকরণ করেছিলেনThe Comedy; পরে ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য রসজ্ঞদের অভিমত অনুসারে এই মহাকাব্য The Divine Comedy নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই মহাকাব্যের বিষয় বস্তুর আলোচনার পূর্বে কাব্যের গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবার কথা নয়। দান্তের আমল ছিল ক্যাথলিক ভাবধারার যুগ, দান্তের জীবনও এই আদর্শ এবং পরিবেশেই গড়ে উঠেছিল। এই ধারার মূল কথা ছিল, সমস্ত বিশ্বব্যাপার

এক সর্বজ্ঞ এবং সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর বা ভগবৎ শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বিধৃত, এই ভাবাদর্শের মধ্যে আবার দুটি ধারা, একটি অদ্বৈতবাদ এবং অপরটি ত্রিত্ববাদ—ত্রিত্ববাদের মূল কথা পিতা, পুত্র এবং আত্মিক শক্তির সমবায়ে ঈশ্বর বা ভগবৎ শক্তির কল্পনা বা এই দুই ধারার প্রতীক হিসাবে 'এক' এবং 'তিন' এই সংখ্যা দুটিকেও লক্ষণীয় বলে গণ্য করা হ'ত।

দান্তের চিন্তাধারায় সামঞ্জস্য এবং মাত্রাজ্ঞান ছিল বিশেষ লক্ষণীয়—তার ডিভাইন কমিডির গঠন পরিকল্পনায় তার পরিচয়ও খুব স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। পিতা, পুত্র এবং আত্মিক শক্তি, এই তিনের সমবায়ে যেমন ভগবৎ শক্তি বা পরমঈশ্বর তেমন নরক বা কৃতকর্মের ফলভোগ বা প্রায়শ্চিত্তের স্থান বা প্রেতপুরী এবং স্বর্গ-রাজ্য এই তিন খণ্ডের সমবায়ে তার মহাকাব্য; কাব্যের এক একটি খণ্ড যেন ত্রিত্ববাদের এক একটি অংশInferno-তে পিতার শক্তি, Purgatory-তে পুত্রের জ্ঞান গরিমা এবং Paradise-এ আত্মিক শক্তির প্রেম বা করুণা। কাব্যের এক একটি খণ্ডে আছে তেত্রিশটি সর্গ বা অধ্যায়; তিন খণ্ডে মোট নিরানব্বই অধ্যায়, তার সঙ্গে ভূমিকার এক অধ্যায় যোগ করে হয়েছে মোট একশত সর্গে কাব্য সমাপ্ত। 'একশত' সংখ্যাটি 'দশ' সংখ্যার বর্গমূল। প্রত্যেক 'দশ' সংখ্যার মধ্যে আছে, 'তিন' সংখ্যার বর্গমূল এবং আরও 'এক' সংখ্যা। ত্রিত্ববাদের প্রতীক 'তিন' এবং সেই তিনের সমবায়ে যে এক পরমেশ্বরের কল্পনা তার প্রতীক 'এক'। আবার সমস্ত কাব্যে রচনার একই ধারা তিনটি পঙক্তিতে এক একটি স্তবক। দান্তের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ তিনটি ঘটনা। বিয়াত্রিচের প্রথম দর্শন লাভ হয় দান্তের বয়স যখন নয় বৎসর, দ্বিতীয়বার দর্শন লাভের সময় দান্তের বয়স ছিল আঠার বৎসর এবং বিয়াত্রিচের অলৌকিক দর্শন লাভের সময় দান্তের বয়স ছিল সাতাশ বৎসর। লক্ষ্য করবার বিষয় এই তিনটি সংখ্যাই তিন সংখ্যার গুণিতক।

এই মহাকাব্যের বিশদ পরিচয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়, এ স্থলে শুধু কাব্যের বিষয়বস্তুর একটু নির্দেশ বা মূল কথা জানান যেতে পারে। ডিভাইন কমিডি একটি রূপক কাব্য; রূপক কাব্যের থাকে বাস্তব জগৎ স্থূলও একটা আখ্যায়িকা অংশ এবং আখ্যায়িকার অন্তরালে ফল্গুধারার মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে একটি গভীর অর্থ দ্যোতনা। দান্তে যেন অন্ধকার বনভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। সূর্যোদয় হলে দেখতে পেলেন একটি মনোরম পর্বতের দৃশ্য। পর্বতের দিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র তার পথ রোধ করে দাঁড়াল একটি চিতা বাঘ, একটি সিংহ এবং একটি নেকড়ে। এমন সময় দেখতে পেলেন একটি ছায়ামূর্তি। ভার্জিলের প্রেতমূর্তি এগিয়ে এসে বললেন তোমার প্রতি সহানুভূতি বশতঃ বিয়াত্রিচে আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে তার নিকটে নিয়ে পৌঁছে দেবার জন্য; কারণ কোনও জীবিত মানুষের সাধ্য নেই এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পারে। ভার্জিল দান্তেকে নিয়ে চললেন নরকের পথে এবং নরক রাজ্যের মধ্য দিয়ে; পথের বিভিন্ন স্তরে পরলোকগত বহুজনের সঙ্গে দেখা হল। প্রথম স্তরে তারা দেখতে পেলেন। হোমার, হোরেস ওভিড, লুকান-এরা খৃষ্টের জন্মের পূর্বে জীবিত ছিলেন, সেজন্য তারা খৃষ্টধর্মের জ্যোতি বা করুণা-কল্যাণ লাভ করতে পারেন নি, সেজন্য তারা অনন্তকালের জন্য এখানে আবদ্ধ হয়ে আছেন। কিন্তু পাপীদের মত তাদের কোনও প্রকার শাস্তি বহন করতে হয় না। এক স্তরে এসে দেখলেন ইস্ত্রিয়-

দেহ ভোগ বিলাসীদের মধ্যে আছেন সেমিরেমিস, ডিডো, ক্লীওপেট্রা, হেলেন, একিলীস, প্যারিস, ট্রিষ্ট্রাম, পাওলো, ফ্রানসেস্‌কা। পাপের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে নরক রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে পূর্বপরিচিত দান্তের অনেক আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হল।

নরকের বিস্তৃত রাজ্য অতিক্রম করে তারা গিয়ে পৌছলেন দ্বিতীয় সর্গে—প্রেতভূমি পারগেটোরিতে যেখানে পাপীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে থাকে। এখানেও অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং নিয়তি, পুরুষকার প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হ'ল। পারগেটোরির শেষের স্তরে এসে বিয়াত্রিচের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভার্জিল বিয়াত্রিচের হাতে দান্তেকে পৌছে দিয়ে তিনি নিজে অন্তর্হিত হলেন, কারণ তার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বিয়াত্রিচে দান্তেকে নিয়ে পৌছে দিলেন বারনারড-এর হাতে, তার বেশি ঊর্দ্ধগতি দান্তের পক্ষে এখনও সাধ্য বা সম্ভব ছিল না। বিয়াত্রিচে স্বস্থানে ফিরে যাবার পূর্বে দান্তেকে যথাসম্ভব ঊর্দ্ধগতির পথে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। প্রসঙ্গতঃ গ্যেটের 'ফাউষ্ট' কাব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে : মার্গারেট পিতা পুণ্যবলের প্রসাদে স্বর্গরাজ্যে পৌচেছেন, কিন্তু ফাউষ্টের উদ্ধার সাধন না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গ-রাজ্যে গিয়েও তার মনে আনন্দ নেই, চিত্তে শান্তি নেই। দান্তের এই মহাকাব্যের তাৎপর্য ক্যাথলিক মত অনুসারে মানবাত্মার নরক, প্রায়শ্চিত্তের প্রেতপুরী এবং স্বর্গরাজ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কল্পনা। মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অবস্থার চিত্র কল্পনা।

আজকের কবিতা ও পাঠক

আজকের পাঠকের মুখেও যখন সাম্প্রতিক কবিতার দুর্বোধ্যতার কথা শোনা যায় তখন তাকে মনে হয় সেই পুরোনো ঘটনারই অনুসরণ। আজকের পাঠক নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবী। তার মনের কাঁচা মাটিতে এখন অনেক রোদ-জল-ঝড়ের আঘাত পড়েছে। মাটিও শক্ত হয়েছে। তবুও কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকের এই অনুদারতা একদিক থেকে বেদনাদায়ক। পাঠকের দিক থেকে দেখা যায়, কাব্য পাঠকের চেয়েও গল্প-উপন্যাসের পাঠক-সংখ্যা বেশি। সাম্প্রতিককালে যখন ছোটগল্প উপন্যাসও নতুন পথে যাত্রা করেছে এবং ছোট গল্প যেখানে কবিতার নিকটতর প্রতিবেশী, সেখানে পাঠকের মন কাব্যপাঠের প্রস্তুতি পেয়েছে আশা করা যায়।

কিন্তু উন্নাসিক কিছু কবিকুল যদি পাঠককে অগ্রাহ্য করে কাব্য রচনা করতে চান, এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমিত পাঠক রাখেন তবে তাঁরাও ভুল করবেন। কেন না সাহিত্য যতই উদ্দেশ্যহীন হোক, পাঠক নিরপেক্ষ নয় কখনোই। কবিতা রচনা করবার সময় সামনে পাঠকের উপস্থিতি কবিকে অনুভব করতে হয়। আমি একথা বিশ্বাস করি, জনসাধারণের সাহিত্য বলে কোনও উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য নেই। সাহিত্য বস্তুটি বিশেষ শিক্ষিত মনের (তথাকথিত শিক্ষিতের কথা বলছি না) অনুভবের বস্তু। সাহিত্যরসবোধ ব্যাপারটি কিছু কিছু মনের অধিকারমাত্র। সর্বক্ষেত্রে তাকে পাওয়া যায় না। তবুও কবিতার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে পাঠক অন্যতম—বলা যায় উদ্দীপন বিভাগ। সুতরাং পাঠকের প্রতি কবির একটি দায়িত্ব আছে। কবির উন্নাসিকতা এবং পাঠকের অনুদার মন, এই দুয়ের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে জন্ম আজকের কবিতায়।

আমি আধুনিক কবিতা শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না। কেন না আধুনিক কথাটার কাল সীমা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এক হিসেবের যে-কোনও কবি বা কাব্যই তাঁর কালে আধুনিক। হেমচন্দ্র কিম্বা নবীন সেন তাঁদের কালে আধুনিক বলেই গণ্য হতেন। কাজেই বলতে চাই আজকের বা সাম্প্রতিক কবিতা এবং সাম্প্রতিক পাঠক।

কাব্যে আধুনিকতা বস্তুটি কি? অধুনা থেকে আধুনিক। যে কাব্যে বিশেষ যুগ-কাল প্রকাশ পায় তাই আধুনিক। সাম্প্রতিক সমালোচকের ভাষায় শুনেছি : কবিতার পরিচ্ছদ বা রচনাকাল কোনও কবিকে আধুনিক আখ্যাত করে না। যিনি তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তির দ্বারা ছিন্ন ব্যক্তিসত্বাকে উপলব্ধি করেন তিনিই আধুনিক। আধুনিক কবি অবনত মানুষের বৈরাগ্য ও যন্ত্রণাকে পাশাপাশি রেখে দেখতে চান।

কিন্তু এই ব্যাখ্যায় আধুনিকতা বিষয়টি কি স্পষ্ট হলো? সাহিত্য দেববাদ থেকে ব্যক্তিবাদে পৌছনো মাত্র যে কবিতার জন্ম হলো, তখন থেকেই এক আত্মানুসন্ধানের কাজ চলেছে। নিজেকে

জানো এবং জানাও—এই মন্ত্রই কবির মন্ত্র। কবির মধ্যে আত্মঘোষণার আকাঙ্ক্ষাই আধুনিক কবিতার জন্ম দিয়েছে, কাব্যশিল্পের উদ্ভাবন, দেখিয়েছে। এই কাজ বলা চলে কবির। তিনি প্রাচীন হতে পারেন (যেমন বিহারীলাল) আধুনিক হতে পারেন। বিহারীলাল আজকের দিনে আর আধুনিক নন। যন্ত্রণা ও বৈরাগ্যকে পাশাপাশি রেখে দেশার দৃষ্টি সাম্প্রতিক কবির, হয় তো বা আধুনিক কবিরও। কিন্তু ওটিই আধুনিকতার সংজ্ঞা নয় আধুনিক কবি তাঁর কাল থেকে বিচ্ছিন্ন নন কখনোই। তিনি সমকালে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আত্মঘোষণা করেন। আসলে পাঠকের পক্ষে বিপদের কারণ এইটেই, সাম্প্রতিক কবিতায় যখন যুগের ঝড়ঝঞ্ঝা তাণ্ডবলীলা ধারণ করে, তখন সেই অস্থির অবস্থা তার মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। আধুনিক হওয়ার দুর্বার প্রয়াস কবিদের মধ্যে প্রায়ই লক্ষণীয়। পাঠককে তারই খেসারৎ দিতে হয়। এই আধুনিকতা একটা ফ্যাসনের নামান্তর। যুগপ্রভাব বজায় রাখতে গিয়ে এখনকার বহু কবিতায় রক্তপাত, শবাধার, চিৎকার, আত্মদহন, ছিন্ন, স্খলিত ইত্যাদি শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়। একই শব্দ যখন বিভিন্ন কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন শব্দটি শক্তিমান হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্থের বিশেষ তারতম্য না হলে শব্দ বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে আধুনিকতা ফ্যাসনেরই নামান্তর। কবিতা যুগ-কাল-সময় উত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত হয়ে উঠলে আধুনিক বা সাম্প্রতিক হয়ে ওঠে না। তখন তা শুধুই—একান্তই কবিতা।

কাব্যে যুগ-জীবনের প্রতিফলন একটা স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে কাব্যরস নামক একটি অশরীরী বস্তু আছে। সেটি অনুভব করবে পাঠক। কবিতা যদি শুধুমাত্র কবির নিজস্ব উপলব্ধি এবং নিজস্ব বোধের বস্তু হয়, তবে তাকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রকাশ বলা অসঙ্গত নয়। কবিতার কোনও সংজ্ঞা নেই, কিন্তু কবিতার একটি মানসিক মূর্তি আছে। ব্যাকরণের মতো কোনোও সংজ্ঞা দিয়ে তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। তবুও, এটুকু বলা যায়, কবিতার মধ্যে একটি বক্তব্য থাকবে, এবং তার মধ্যে কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর তার ঘোষণা রাখবে। একটা আশ্চর্য ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে সেই ভাব, সেই বক্তব্য। এজন্য কবিতায় ব্যঞ্জনা ও ইমেজের এতো প্রয়োজন। বিশেষ শব্দের চাকচিক্য, ছন্দের দোলন কোনওটিই কবিতা নয়। এগুলি তার বাইরের আবরণ। ব্যঞ্জনা ইমেজ সব কিছুকে নিয়ে এবং সব কিছুকে ছাড়িয়ে একটি সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠাই কবিতার কাজ। আজকের কবিতায় যে ফাঁকটুকু থাকে, তা পাঠককে সমীহ করার ফল। ওটুকু ফাঁক পাঠকের বুদ্ধিতে পূরণ করা চলে। কবি সবটুকু প্রকাশ করেন না। ওই অপ্রকাশটুকুই কবিতার ব্যঞ্জনা। তাকে বোঝা যায়, বুঝিয়ে দেওয়া কষ্ট। এক্ষেত্রে আমরা সামান্য উদাহরণের সুযোগ নিতে পারি।

১) আমাদের ঘাসের সমুদ্রে অনেক সবুজ শঙ্খমালার জন্মদিন।
২) সমুদ্র দেখলে জন্মদিনের সকাল মনে পড়ে যায়।
৩) কিম্বা অতি বর্ষণের | রুগ্ন ময়ূরের দল ভিড় করে রাজপথে।
৪) তোমার বাউল দিনের মাটিই আমার প্রথম স্বদেশ
৫) কোন পাখি অসুখের মতো করে বেঁধেছিল ঘনিষ্ঠ সংসার।
৬) এই মৃত নগরীর মধ্যে | দীর্ঘদিন কোনো পান্থশালা কোনো হাহাকার আছে | যাকে

আমি কোনোদিন খুঁজে পাইনি | .....আমি শুনি | দূরের ঘণ্টার ধ্বনি নিজেকেই ডাকে বারে বার।

সাম্প্রতিক কালের কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই লাইনগুলি সহৃদয় পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারেন। এর মধ্যে যেটুকু অস্পষ্টতা আছে তা প্রয়োজনীয়। পাঠকের মনে চিন্তার ছবি অনায়াসে ফুটে উঠে। এগুলিই কবিতার ব্যঞ্জনা ও ইমেজ। অনেকটা জলরঙা ছবির মতো, ধোয়া ধোয়া রং, আবছা তুলির টান, অথচ ভালোলাগার আকর্ষণ সজীব রাখে।

প্রায়ই দেখা যায়, অজস্র ভিড়ে কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত। একই ধরণের ইমেজের বহুল ব্যবহার এবং আপন কণ্ঠকে উচ্চ গ্রামে তুলতে গিয়ে কবিতার ফাঁকগুলি এত বেশি চওড়া হয়ে পড়ে যখন অস্থির পাঠক কবিতার ওপর সেই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ চাপিয়ে শান্তি লাভ করেন।

অথচ সাম্প্রতিক কবিতার ছোট খাটো বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাঠককে সমীহ করবার অজস্র প্রতিশ্রুতি আছে তার মধ্যে। (ছোট খাটো বৈশিষ্ট্যের কথাই বলছি, যেহেতু বিস্তৃতভাবে সাম্প্রতিক কবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার সুযোগ এখনও আসেনি)। একজন সমকালীন পাঠক হিসেবে বলতে পারি যে কবিতা আমাকে ভাবায় না, তাকে কবিতা বলতে অস্বীকার করবো। পাঠকের বুদ্ধির এবং অনুভূতির দরজায় কবিতাকে পৌঁছে দেওয়াই তো কবির কাজ।

আর একটি ছোট উদাহরণ হাতের কাছে পাওয়া যায়, সেটি হলো, বহুক্ষেত্রেই কবিতায় যতিচিহ্নের অব্যবহার। এটিও পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই উদ্ভূত। পাঠক অনায়াসেই যথাস্থানে যতিচিহ্ন বসিয়ে নিতে পারে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

পথে পথে সহরের ঘূর্ণিভিড়ে সহরতলিতে
আমার বন্ধুবর আমি
কখন হঠাৎ
আমাদের বয়সের ছায়া নেমে আসে
শব্দের ধূসর সারি স্বপ্নের ধূসর ক্লান্তি আর
সমস্ত পথের মোড়ে থমকানো আলো।

কবিতার এই স্তবকটিতে উপযুক্ত ছেদচিহ্ন আমরা অনায়াসেই বসিয়ে নিতে পারি।

পাঠকের কানকে পীড়িত না করার জন্যই অভিনব শব্দপ্রয়োগ, ছন্দের বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য এটা ঠিক নতুন ঘটনা নয়। কবিরা চিরদিনই পাঠককে সম্মুখে রেখে কবিতা লিখেছেন। আজকের কবি সেক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বেশিই সমাদর করেছেন।

পাঠক ও কবির মধ্যে সহৃদয় হৃদয় সংবাদের প্রয়োজন, নইলে কাব্যরচনা নিরর্থক। জীবন যতোই জটিল হোক কবিতা তার নিজস্ব মণিদীপ্ত কক্ষে থাকবেই। জোর করে কবিতায় রুঢ়-নগ্ন বাস্তবতা আনলে নতুনত্ব আসতে পারে কিন্তু কাব্যেরও মৃত্যু ঘটে। পূর্ণিমা চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি' বললে অভিনবত্ব দেখা যায়, যুগজ্বালাও প্রকাশ পায়—কবিতা চিরায়ত হয়ে ওঠে না। যুগে যুগে এক্সপেরিমেণ্ট চলতে পারে, কিন্তু যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহারের গুরুচণ্ডালী দোষ কবিতায় কোনও

স্থায়ী আসন পাবে না। কালের খতিয়ানে সেই সব কবিতা কতো কাল টিঁকে থাকবে বলা শক্ত।

কিন্তু পাঠকের মনকেও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়ার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর জন্য আরো কবিতা পাঠের প্রয়োজন। (আমি আরো কবিতা পড়ুন আন্দোলনের কথা বলছি না। আন্দোলন করে কবিতার প্রচার হয় না)। সর্বসংস্কারমুক্ত শিক্ষিত পাঠকমন তৈরি হলে কবিতাও দুর্বোধ্যতার মুখোশ খুলবে। যে জিনিস একবার পড়ে ভালো লাগেনি দ্বিতীয় তৃতীয়বারে তা ভালো লাগতে পারে। আসলে নতুন জল হাওয়া সহ্য হতে সময় নেয়। পাঠকের বুদ্ধিতে মরচে না পড়লে অন্তত কিছু সাম্প্রতিক কবিতা অপাঠ্য হয়ে উঠবে না বলে আশা করা যায়।

ইদানীং কবিতার পাঠক সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাকিরা কবি এবং কবি পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ উপগ্রহ। এই নিয়ে কি বাংলা কবিতার পাঠক তৈরি হবে? বাংলা কবিতা কি জীবনানন্দ দাশের পর থেমে যাবে? এমন ভ্রান্ত ধারণা পাঠকের মন থেকে মুছে দিতে পারেন পাঠকই, যিনি সত্যিকার সহৃদয়। বাংলাদেশে আজ কবি ও কবিতাপত্রিকার অভাব নেই। এই ভিড়ে পাঠক হোঁচট খেতে বাধ্য হবেন। কবিতার গুণাগুণ নির্ণয়ে হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়বেন। তবে অজস্র খারাপ জিনিসের মধ্যে ভালো জিনিসের স্বাদ অবশ্যই মিলবে। অন্তত এ বিশ্বাস আমাদের এখনো আছে।

সুচেতা ভট্টাচার্য

স মা লো চ না

আকাশ প্রদীপ ॥ সুখরঞ্জন রায়। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ—কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

বর্তমানকালের মানুষ প্রতিমুহূর্তে বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। সে তার আপন কল্পনাতেও আস্থা স্থাপন করে থাকতে পারে না; কারণ সেক্ষেত্রেও বাস্তবতার সংঘাতে আঘাতপ্রাপ্তির আশঙ্কা বিদ্যমান। ফলতঃ অন্তরাবেগের অভিব্যঞ্জনা, কেবল বিতৃষ্ণা আর অবিশ্বাসের অভিব্যক্তিই সে সকল কাব্যে ফুটে ওঠে। আধুনিক কবিতার যেখানে এহেন অবস্থা সেখানে সুখরঞ্জন রায়ের 'আকাশ প্রদীপ' এর মত একটি পরিপূর্ণ রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ বর্তমান যুগের মনন-ধ্যানকে কতখানি ব্যক্ত করতে পারবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বস্তুত আকাশপ্রদীপ একটি পথিকের আত্মিক আরোহণের কাহিনী। এ পথিক সার্বজনীন পথিক—উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, প্রথমপুরুষ, যে কেউই এ পথিক। প্রত্যেক মানুষেরই নিগূঢ় বাসনা কোন এক অতীন্দ্রিয় চিরন্তন সত্যের দিকে ধাবমান। তাঁর কাছে জাগতিক ভোগ একসময় অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যও, শিশুর চুষিকাঠির ঝুমঝুমির মতো অবাঞ্ছিত, অতিরিক্ত বলে মনে হয়। তখন তার পিয়াসী মন সন্ধান পেতে চায় এমন কিছুর যা হবে অশেষ অনন্ত অভঙ্গুর অপরিবর্তনশীল। প্রতিটি মানব মনে রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা বাসা বেঁধে আছে। 'আকাশপ্রদীপ' সেই চিরাচরিত আকাঙ্ক্ষার কথা স্বচ্ছন্দে এবং স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত করেছে।

পথিকের ঊর্ধ্বযাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে কবিকে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন রূপকের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইত্যাকার মাধ্যমে কবি হয়তো বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে পথিকের সংস্পর্শকে বোঝাতে চেয়েছেন। সেসব মানুষ কখনও অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত ভীত সন্ত্রস্ত, আবার কখনও অজ্ঞানতার অন্ধকারের আবরণে ঢাকা কৃত্রিম ও আবেগশূন্য। এরই মধ্যে থেকে পথিক খুঁজে নিতে চাইছে আপনার ঈপ্সিতাকে। কিন্তু প্রাপ্তির পরেও পথিকের মনে হলো এ পাওয়া পরিপূর্ণ করে পাওয়া নয়। বুঝতে পারল রমণীর সাথে মিলনে একটা সাময়িক সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় বটে তবে সেটাকে তার সাধনার একমাত্র মোক্ষ বলা যায় না। পথিকের আকাঙ্ক্ষা: 'অমর প্রেমের ছুটি।' রমণীর প্রেমে অমরত্ব নেই, তা কখনও ভাবনায় উজ্জ্বল, কামনায় উদ্বেল আবার কখনও পঙ্কে কলঙ্কিত অপ্রত্যাশিতের আঘাতে জর্জরিত। কবির এ প্রত্যয়ও চিরন্তন ও সার্বজনীন। সুতরাং তাঁর কাব্য কল্পনাশ্রিত হলেও মানব জীবনের চিরাচরিত রীতিনীতিকে ব্যক্ত করেছে।

বলাবাহুল্য 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও হেমচন্দ্রের 'ছায়াময়ী'র প্রভাব পরিলক্ষিত। তৎসহ শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' এবং 'দি মারচেণ্ট অফ ভেনিস' নাটক দুটিকেও যোগ করা যেতে পারে:

১। 'আকাশ প্রদীপ'-এর ভূত তাড়ানোর মন্ত্রটি (পৃঃ ৮) মনে করিয়ে দেয় ম্যাকবেথের

ডাইনীদের প্রায় একই ধরনের মন্ত্রোচ্চারণ :—

...Eye of newt and toe of frog
Wool of bat and tongue of dog
...etc (IV, 1, 14...36)

২। পথিক ও রমণীর পরস্পর প্রেমাবৃত্তিতে (পৃ: ৫৬।৫৭) 'দি মারচেণ্ট অফ ভেনিসের' লোরেনজো জেসিকার প্রেমালাপ বাক্যের পুনর্ব্যবহারের প্রক্ষেপ বিদ্যমান—

Lor. ...in such a night...etc.
Jes. In such a night...etc.
(V, 1, 1...20)

কাব্যের ছন্দ, ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র বিশেষে কখনও লিরিক ধর্মী আবার কখনও অমিত্রাক্ষর। গতি সাবলীল ও নিরলস। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পাঠ করতে পারলে কাব্যের আবেগ পাঠকের হৃদয়-প্লাবনে সফল হবে।

অর্ধশতাব্দীর পর বইটির পুনর্মুদ্রণ হলো। বর্তমান গ্রন্থটির সামনে এবং পিছনের দিকে বিশিষ্ট সাহিত্য নেতৃবৃন্দের মিছিলের মাঝখানে কাব্যকাহিনীটিকে স্থাপন করে গ্রন্থনায় পারিপাট্য আনা হয়েছে। এতে কাব্যটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু এটি সাধারণ পাঠকের কতখানি চিত্তাকর্ষণ করবে বলা কঠিন। কারণ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার সম্ভব তাতে হৃদয়-বিজয় হয় না।

পরিশেষে বলব, আধুনিক জীবন যাপনের জটিলতায় আমরা যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি না কেন মাঝে মাঝে 'আকাশ প্রদীপ'-এর মতো রোমাণ্টিক কাব্যগ্রন্থ সে জটিলতা থেকে আমাদের ক্ষণিকের জন্যও মুক্তি দেয়। অর্থলোলুপতা, সময় স্বল্পতা, অবিশ্বাস, হতাশা ইত্যাদি আমাদের পারিপার্শ্বিক বাতাসকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে রাখলেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি, মাথার উপর এখনও সুনির্মল আকাশ রয়েছে, পাখিরা এখনও গান গায়।

শোভন গুপ্ত